প্রতিভার অপমৃত্যু

সভব গ্রন্থাগার
১৩৫১ সাল
পাড়া, কাশী

শ্রীনির্মল সুর

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
সংহতি পাব্লিশিং হাউস
৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৩১৮
মূল্য—দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
অজন্তা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা

ব্রতী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

দেড় যুগ পিছনে তাকালে দেখতে পাই তখনও আমি ছাত্র, আর ছাত্রদের সঙ্গে মেশা আমার নেশা ও আনন্দ। তখন দেখেছি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রতিভাবান কিশোর যুবকদের প্রাচুর্য্য—বিদ্যালয়ে, ব্যায়ামশালায়, খেলার মাঠে, পাঠাগারে, রাজনীতিক্ষেত্রে এবং সমাজ-সেবায়। আজ সকলক্ষেত্রে প্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছে যুবক ও কিশোরদের মধ্যে। তার বদলে পথে, ঘাটে, দেখি নকল দেবদাসের দল আর জোলো মনস্তাত্ত্বিক কবি সাহিত্যিকের ভিড়। আর মেয়েরাও ভালবাসে—বিলাস আর ভোগ, মিহি দায়িত্বহীনতা। সিনেমা আর পচা-সাহিত্যের মনস্তত্ত্ব ও প্রেমের দুর্গন্ধে কত মেধাবী শক্তিমান প্রতিভার অপমৃত্যু যে হচ্ছে তার জঘন্য দৃশ্য নিত্য দেখতে পাই আজ। বাংলার যুবক কিশোরদের এ মোহ কবে ঘুচবে কে জানে। শিক্ষা, খেলা, ব্যবসায়, রাজনীতিক্ষেত্রে আবার প্রতিভার পুনর্জন্ম হোক, মেয়েরা প্রেরণা দিক প্রতিভাকে, সাহিত্য জয়গান করুক প্রতিভার- বাংলার আকাশে প্রতিভার আলো বিচ্ছুরিত হোক এ আশা নিয়ে "প্রতিভার অপমৃত্যু" আত্মপ্রকাশ করলো।

শ্রীনির্মল সুর

শুভী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, হাবড়া

প্রথম পর্য্যায়

অজয় যদি আগেই জানতো যে কাব্যজগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের এতখানি পার্থক্য, তাহলে ওর স্ফুটনোন্মুখ কাব্যস্পৃহা বাস্তবের উত্তাপে অঙ্কুরেই ঝরে যেত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর কোথায় ?

মানব-মনের রহস্য অনন্ত। সে রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করা সহজ-সাধ্য নয়। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের কন্দরে কন্দরে অলক্ষ্যে কত ফুল ফোটে, সবার অলক্ষ্যেই তা আবার ধূলায় শয়ন লাভ করে। সন্ধান তার ক'জনই বা রাখে ? ফুল কেন ফোটে, কে জানে ! কেউ লাভ করে ধুলিশয্যা—আবার কেউ বা গলার মালা হয়ে দোলে। তবু ফুলফোটা নিত্যকাল ধরেই চলে। শুধু যে ফুল ঝরে ধূলায়—সে রেখে যায় বেদনার ইতিহাস। মানুষ রূপের পাগল না ব্যথার পাগল—কে বলবে ?

অজয় ছিল সত্যকারের কবি—অন্তরে ও বাহিরে। কলেজে থাকতেই প্রফেসর যখন বুঝিয়ে যেতেন অঙ্ক—ক্যালকুলাসের সূক্ষ্ম বিবর্ত্তন বোর্ডের গায়, ও তখন তা'থেকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতো কবিতার রাইম। সোজা সোজা লাইনগুলি সাজান বোর্ডের গায়, বাঙলা ভাষার অক্ষরগুলি না হয়ে হোলই বা গণিত-শাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য সংখ্যার শ্রেণী ? তবু একটা প্রতিপাদ্য জিনিষকে

নিয়ে লাইনের পর লাইন সাজিয়ে সমাধানের পথে এগিয়ে আনা। কবিতার উদ্দেশ্যও তো একই। কতকগুলো কবিতা হয় মিষ্টিক ধরণের—লোকে বলে ভাব সম্পদে ঠাসা। ক্যালকুলাসও তাই। ক'জন ছেলের কাছে ওর আসল অর্থ ধরা পড়ে? হ্যাঁ সবই কবিতা। গণিতশাস্ত্র কবিতা, রাস্তা দিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ী চলে তার চাকায় বাজে কবিতার রাইম। আদালতে পেয়াদা আসামী ডাকে—'বানোয়ারী-লাল হাজির হায়?'—সেখানেও নিগূঢ় অর্থ, কবিতার ছন্দ। রাস্তা দিয়ে চলে অগণিত মানুষ, প্রতিজনের পদক্ষেপে বাজে কবিতার নাচনতাল। মানুষ হাসে, মানুষ কাঁদে তাতেও কবিতার রূপ। মোটকথা কবিতা অনন্ত। জগতের অণুতে অণুতে, গ্রহতারকায় সাগরজলে দোল খায় কবিতা সুন্দরী।

এই ছিল অজয়ের ধারণা। দুনিয়ার আর সব কিছু ওর কাছে লুপ্ত। কিন্তু রাস্তা ছিল—ঠিক 'মহাজনো যেন গতঃ' —স পন্থা নয়। দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে রাস্তার অন্ধকারময় কোণে যেখানে মানুষের বিবেক আত্মহত্যা করে, মানুষের সঞ্চিত আশা যেখানে হাহাকারে লুটিয়ে পড়ে—সেখানে চলতো ওর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ। কমল-বিলাসী কবি ও নয়। ছন্দে ছন্দে ঝরে পড়ে আগুনের ঝলক, লাইনে লাইনে কেঁদে ওঠে রুদ্ধ বেদনার হতশ্বাস।

ওর বাপের যে বেশী সঙ্গতি ছিল তা' নয়—তবু তাঁর পরিত্যক্ত সংসার চলে যেত সহজেই—আড়ম্বরবিহীন স্বচ্ছ জীবনযাত্রা। ও ভাবতো, নাই বা থাকলো ওর মোটর গাড়ী, ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্ক। বাইরের সম্পদটাই কি সব? দেশের মাঝে অগণিত লোক চিবায়

গাছের পাতা—তাদের খাবার কেড়ে নিয়েছে কে? সহস্র জনে দরিদ্র্যের অন্নে ভাগ বসিয়ে তবে না একজন ঔদ্ধত্যের ইমারত গড়ে, মোটর হাঁকায় ওদেরই বুকের পঞ্জরে পঞ্জরে? আর এও তো ঠিক যে বাইরের এই বাস্তব সম্পদ—তাকে খরচ করে ছুদিনে শূন্য অঙ্ক টেনে আনা যায়।

অন্তরের সম্পদইতো আসল। তাকে কেউ হীন করতে পারে? খরচ করলে বরং বেড়েই যায়—নিঃশেষ হবার ঠিক উল্টো। ছেঁড়া কাপড় হয়তো অজয়ের দৈন্য ঢাকতে পারে না, লোকে হাসে; কিন্তু ওরা কি সন্ধান রাখে অন্তর সম্পদের? সেখানে যে নিত্য নূতন ভাবের খেলা। কত অর্ঘ্য এসে পড়ে ওর এই মলিন চরণে—অর্থাৎ অজয়-কুমারের ভাব-সম্পদের পদমূলে। অজয় কেন লিখছে এবং লিখবে—তাতেই না কতলোক বাড়িয়ে তুলবে জমার অঙ্ক, তাতেই না দেশ-বিদেশের লোক চিনবে বাঙালীকে? রবিঠাকুর খানিকটা সম্মানার্হ করেছেন দেশকে। বাঙলাকে, তার বাঙালীকে জগতের সামনে দাঁড় করিয়েছেন তার মুখে কাব্যের ফোকাস্ ফেলে। প্রতিভা অজয় বোস তাকে দীপালোকের মালায় সাজিয়ে সাহিত্য-লোকের গেটপাস্ দিয়ে তাকে নিয়ে বসাবে জগৎ-সভার মাঝখানে।

কলেজ থেকেই আমাদের মধ্যে অদর্শনের সুরু। একই সহরে বাস, আর একই কলেজের সহপাঠী—তার ওপর আমি ছিলাম বিশেষ করে ওর সমজদার—ওর বাল্যবন্ধু এবং বিশেষ বন্ধুও বটে। সেই

সূত্রেই ওর গোড়ার ইতিহাসটা ছিল আমার জানা। কে জানে—হয়ত একদিন একটা হিসাব করা হবে—কতজন প্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছে; লেখা হবে তাদের জীবনায়ন—যে কারণে তাদের প্রতিভা আত্মহত্যা করেছে তার নজীর সমেত—সেদিন হয়ত আমার এ লেখা লাভ করবে সম্পূর্ণ সার্থকতা।

কলেজ থেকে বেরিয়ে ও আশ্রয় নিল ওর ছোট ঘরটাতে, যেখানে আলো প্রবেশ করে সংকুচিত হয়ে। ও বলতো—আমার অন্তরের আলোকই যথেষ্ঠ। আর অন্ধকার না থাকলে আলোর প্রেরণা ঠিক আসে না তা তো জানিস্, অম্বিত?

কলেজে থাকতে ওর লেখাপড়ার জন্যে পয়সা খরচ করতে হতো না—কিন্তু তারপরও ওর লেখা পড়বার রোগ আমার যায়নি। পক্ষপাতিত্ব বললে আমারি অমর্য্যাদা করা হবে, ওর লেখার নয়। কারণ ইচ্ছা করেই বহু পাঠাগারে ঘুরে অপরিচিতের মত ওর লেখার বক্র-সমালোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে আমার বিপক্ষীয়েরা দলে অনেক ভারী অর্থাৎ অলক্ষ্যে আমারি স্বপক্ষতা প্রকাশ করেছেন।

চাকরী নিয়ে বিদেশে চলে গেছি। খবর ওর বিশেষ কিছুই পাই

না—সে আজ অনেক দিনের কথা। তবুও ওর কথা মাঝে মাঝে ভাবি। ওর জীবনের বহমান প্রতিটী দিন হয়তো স্বপনের রঙে রঙীণ হয়ে উঠেছে, প্রতিভার আলোকে হয়তো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ওর দিঙ্মণ্ডল। কল্পনায় কত কথাই ভেবে যেতাম—যখন পড়তাম ওর লেখা কাগজের পাতায়।

'সুচিত্রা' তখন রেখেছে মাসিকের বাজার গরম করে। যাদের লেখায় ওর পদগুলি ঠাসা থাকতো—তারা নাকি সাহিত্য-গগনের এক একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এ হেন 'সুচিত্রার' পাতায় ওর লেখা পড়ে বিদেশেই অনুভব করতাম গর্ব্ব। পাঁচজনকে ডেকে দেখতাম ওর লেখা—দেখতো এ লেখাটা কেমন ? প্লটের কায়দা আছে না ? বর্ণনার ধারা অপরূপ। ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে জীবন্ত ছবি—কেমন তাই না? এঁর নাম তোমাদের কাছে সুপরিচিত কো বটেই কিন্তু জানো কি ও ছিল আমারি ক্লাস-মেট—বলে একটু গম্ভীর ভাবে চেয়ে থাকতাম সবার মুখের পানে।

'সুচিত্রা' বরাবরই কিনতাম। প্রতি সংখ্যাতেই আশা করতাম ওর রচনা। কিন্তু তা কি সম্ভব ? না তা ভালো ? রবিঠাকুরই একঘেয়ে হ'য়ে গেল প্রতি কাগজে বা প্রতি সংখ্যাতে লিখে লিখে। নিজের ভক্তদল ছাড়া কি অন্য কেউ তা বরদাস্ত করতে পারে ?—সন্তার তিন অবস্থার মতো। মানুষের মনে বিরহ ও ঔৎসুক্য জাগাতে না পারলে কি কোন কিছুর দাম বাড়ে—বাপের বাড়ীমুখো না হওয়া স্ত্রীর মতো ? অজয় বোস তাই পাঠকের কাছে বড় আকস্মিক এবং যখনই ধরা দিত সে বড় জীবন্তভাবে। কখনো বা কাঁদাতো ওর

পাঠককে, আবার কখনো শিখিয়ে দিত দেশের বর্তমান সমস্যার সমাধান হাসির কশাঘাতে। 'হাসির কশাঘাত' কথাটা যদি পছন্দ না হয়, আধুনিকভাবে বলতে পারো সুগার-কোটেড কুইনিনের ডোজে।

কিছুদিন অজয় বোসের নাম সুচিত্রার পাতা থেকে মারলো ডুব। কিনতে লাগলাম অন্য কাগজ আশায় আশায়। বিরহী প্রেমিকার মতো—মানে বাধার বেড়ায় ঘেরা প্রেমিকার কথা বলছি—যে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ক্বচিৎ প্রিয়তমরূপী চোরা জীব প্রবেশ লাভ করতে পেত পাঁচদিক ঘুরে—আমার চাওয়া সার্থক হতো কোন হঠাৎ পাওয়া কাগজের ফাঁক দিয়ে। তারপর কিছুদিন বাদে তাও আবার দুর্লভ হয়ে উঠলো—যে অবস্থায় প্রেম টিকিয়ে রাখা শক্ত নিতান্ত সাধক পদবাচ্য ছাড়া। ভাবলাম—আজকাল হয়েছে এক ফ্যাসান ছদ্মনামে লেখা। অজয় হয়তো ধরেছে সেই রাস্তা। ওই যে 'ধৃতরাষ্ট্র' বলে লেখক আজকাল আসর জমাতে চাইছে, সেই হয়তো 'অজয়' নামটাকে শিখেছে পকেট জাত করে। কিম্বা 'কাণফুল'—দূর ছাই স্ত্রীং কি পুং বুঝবার উপায় নেই। এই ছদ্মবেশী বহুরূপীরা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী নামের বাহাদুরীতেই। অমূল্য, গদাধর, বলাই, অজয়, এসব নাম সাধারণতঃ ক'জনের মনে থাকে? নাঃ অজয় বোসের বুদ্ধিতে সিঁদুরে রঙ ধরেছে। আবার ভাবি তাইতো নীলিমা বোস তো অজয় বোস নয়? প্রিয়ার নামকে হয়তো অমর করে রাখবার চেষ্টা!

অনেকগুলি বছরের আয়ু ফুরিয়েছে। একঘেয়ে জীবনে আসে বিরক্তি। তাই তার স্বাদ বদলিয়ে নেবার জন্যে ছুটীর দরখাস্ত। ফিরে এলাম বাঙলা মায়ের শ্যামল বুকে—একেবারে কলকাতায় যেখানে

'শ্যামলিমা' কথাটা উচ্চারণ করাও মস্তিষ্কবিকৃতি বলে ধরা যেতে পারে। জীবন্ত মোটঘাট নিয়ে উঠলাম ভবানীপুরে, মানে ভর করলাম শ্বশুর দেবতার স্কন্ধে।

সেদিন পুরাণো 'সুচিত্রার' পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল অজয়ের কথা। তার ওপর সেই যে এদের বাড়ী এসে ঢুকেছি, কোথাও বেরুনোও হয়নি। এরাই বা মনে করবে কি ভেবে অজয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবার সদিচ্ছাটা আমায় চেপে ধরলো। ভাবলাম—উদীয়মান—তাইবা কেন, প্রতিষ্ঠাবান একজন জ্যোতিষ্ক যার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য কত লোক হয়ত উদ্‌গ্রীব—আর আমি কিনা এতদিনের প্রতিষ্ঠাবান সম্পর্কটাকে বিসর্জ্জনের হাত ধরাতে চলেছি!

সেদিন বিকাল বেলাতেই বেরুলাম অজয়ের বাড়ীর দিকে পুরাতন বন্ধুত্বকে ঝালিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। কথার শো'কেস্ থাকলে আগের কথাটাকেই এক প্রচণ্ড ঘা দিয়ে বলতাম বিসর্জ্জনের হাতকে বেহাত করতে। রাস্তায় বেরিয়ে ভাবলাম—কি জানি সেখানে সে আছে তো? যাইহোক একবার খোঁজ করে আসা যাক্। মনকে তবু বলা যাবে—চেষ্টার ক্রটী নেই, সিদ্ধির পাত্র ভগবানের হাতে।

মানিকতলার এক অপ্রশস্ত রাস্তা। ২৮নংই ছিল অজয়ের বাড়ী? চিনতে পারবো তো ওদের বাড়ীটা? এতদিনে হয়ত কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। পুরাণো বাড়ীটাকে নিশ্চিহ্ন করে যেখানে মাথা তুলেছে হালফ্যাসানের চমকপ্রদ আর্কিটেকচার। হ্যাঁ তাওতো বটে, বালিগঞ্জেও সেদিন যে অদ্ভুত বাড়ীটা দেখলাম, সেই যে নামটা 'কাব্য-মঞ্জুষা' না কি—সেটাই তো অজয় বোসের বাড়ী নয়? হ্যাঁ বিস্ময় লাগে ওই

পাড়াটার কথা ভাবলে।—সেদিনও দেখা গেছে ওটা একটা পতিতা। আলাদীনের প্রদীপের যাদুতে ওটা যেন একরাত্রেই বদলে গেছে—শুধু নামটা……হ্যাঁ বালীগঞ্জ হলে মন্দ হতো কি? যাই হোক—'মঞ্জুষা'র ভিতর পানে একবার খোঁজ করে দেখলেই ভালো হতো—এতটা পাড়ি দেবার কষ্টটা হয়তো বাঁচতো।

হ্যাঁ এইতো আটাশ নম্বর। বাড়ীটা এখানে আছে দেখছি। কিন্তু অজয়ের বদলে ওর ভাড়াটীয়া দেবে নাতো তাড়া?

—অজয়! অজয়বাবু!—

ডাকবো নাকি 'কাশফুল' বলে? অথবা ধৃতরাষ্ট্র? উহুঁ নীলিমা দেবীই হয়তো হবে। কি জানি কি ব্যাপার। তার চেয়ে অজয় বলেই ডাকা যাক্।

—আরেঃ! অজয় না?

—হ্যাঁ, তাইতো আমারো মনে হচ্ছে।

—কেমন আছিস্?

—আছি? হয়ত ভালই। কিন্তু কবে এলি? কই জানাস্নি তো যে কলকাতায় ফিরেছিস্?

—মুখ বদলাতে এমনি চলে এলাম ভাই।

—কোথায় উঠেছিস্? নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চয়ই?

—ডাঃ ব্যানার্জ্জীর বাড়ী—লিলির বাবা—ভবানীপুরে—নিরাপদ হয়ত বা।

—কি করছিস্, সেই চাকরীই?

—হ্যাঁ প্রমোশান পেয়েছি, আট-শ অবধি গ্রেড্। আর তুই?

—আচ্ছা বলছি চল। ভালই হলো। আমি ভাবছিলাম নিজেই একবার যাবো দেখা করতে।

—আমার সঙ্গে ?

—হ্যাঁরে, প্রয়োজন আছে।

আমার সঙ্গে সাহিত্যিক মানুষের প্রয়োজন! এ দেখি উল্টো উৎপত্তি। পাবলিশার আমি নই যে টাকার তাগাদা করতে যাবি।

—তা জানি, আর সেই জন্যেই।

—ভাবিয়ে তুললি দেখছি—কিন্তু প্রয়োজনটাই শুনি ?

—আছে প্রয়োজন। পরে বলা যাবে।

অজয়ের চেহারায় কি এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন—যা আমার মত নীরেট লোকের চোখেও ঠেকে। কথা বলার ধরণটা……না তখন তো ঠিক এই গ্রামে বাঁধা ছিল না ওর সুর! তবু আমার সঙ্গে ওর সেই বন্ধুত্বের বাঁধন কোথাও আল্‌গা হয়েছে বলে মনে হলো না।

অজয় জিজ্ঞাসা করল—কিরে, নির্ব্বাক যে! আর চেয়ে চেয়ে দেখছিস্‌ই বা কি ? নবীনত্ব কিছুর সন্ধান করেছিস্ ? ও রোগ এখনো গেল না ? তোর হৃদ্-সরসীর ওয়াটার-লিলিকে বলে দেব ?

হেসে বল্লাম—ওয়াটার-লিলি ? হ্যাঁ ওয়াটার-লিলিই বটে; ঐ জাতীয়দের সব কিছু বাষ্প হয়েই যায় কিনা।

অজয় বারেক চোখ বোজাল, কিন্তু সে ক্ষণেক। পরক্ষণেই সে দুটো আরো দীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

বল্লাম—সে থাক্; কি নামে লিখিস্ আজকাল ? ধৃতরাষ্ট্র ?

ক্ষীণহাসির রেখায় জবাব হলো—না, লৌহভীম—যে চূর্ণ হয়েছিল অন্ধের আলিঙ্গনে; না না অসিৎ তাতো নয়—চূর্ণতো সে হয়নি, কলির ভীম কিনা ?—এই বলে অজয় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলো—ছেলেটা তেমনি পাগলই আছে দেখছি। নাঃ প্রাণশক্তি আছে। হোপলেশ লিলি আর সিলির দল।

—বারে—ভেতরে চল—খানিকটা গল্প করা যাক্। সময় হবেতো ?

—কোন অসম্ভাব তো বর্ত্তমানে দেখছি না।

—তবে চলে আয় ভিতরে গিয়ে বসা যাক্।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

পূবদিককার এক নাতিপ্রশস্ত ঘর। মাঝারি গোছের এক সেক্রে-টারিয়েট টেবল্। তার ওপর সাজান—দোয়াতদানি, গোটা তিনেক ঝরণা কলম, পেন্-ষ্ট্যাণ্ড, বিস্তর কাগজপত্র আর ফাইল। টেবলে বসানো একটা লাইট্ গ্রীণ শেডের বিজলীবাতি—হয়তো কবিত্বের সাক্ষী আর উপকরণ ওরা। এধারে তিনখানি আরাম কেদারা, গোটা পাঁচেক এমনি, আর কোনটায় দাঁড় করান এক পোর্টেবল টাইপরাইটার।

বাহির থেকে ঘরটাকে যা মনে হয় এ ঠিক তা নয়। এরও আছে অন্তর্নিহিত সম্পদ বা সৌন্দর্য্য—অন্ততঃ তারি পরিচয় দিচ্ছে এর আসবাবপত্র। ঘরের ওর শ্রী ফিরেছে—অঙ্গে অঙ্গে ঝড়ে পড়ে মার্জ্জিত রুচির পরিচয়।

ছোট্ট একটা ছেলে ওর হুকুম তামিল করে। বাড়ীর ভিতরের খবর ঠিক জানি না।

তাইত, ওর বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করাও হয়নি। কি মনেই বা করবে ও!

—হ্যাঁরে অজয়, মা কেমন আছেন রে?

—ভালই আছেন, তবে চিরস্থায়ী বাত ধরেছে।

—আর সকলে?

—আবার কার কথা জিজ্ঞাসা করছিস্ রে?

এম্-অব্-লাইফ, বিশেষ টেষ্টই ধর না, তার দাঁড়ি-পাল্লায় পাত্র শূন্যে দোল যায়। এখন মফস্বলে ডাক বিভাগীয় অর্থ দিয়ে সামান্য একটা বাড়ী করে বাড়িয়ে চলেছেন ভাড়াটিয়া ঘর। দরাজ মন সঙ্কুচিত হয়ে এসে আশ্রয় করেছে অশিক্ষা-সুলভ কুসংস্কারকে। কোথায় রইল টেষ্ট, আর কোথায়ই বা সাবলীলতা। টেষ্ট থাকলেই যে জীবনের টসে জিতবে তার কোন মানেই নেই। বরং বিশেষ টেষ্ট থাকাটাই বিপদ-জনক—চলার পথ দুর্গম হ'য়ে ওঠে। জগৎটাই যে কিম্ভূৎকিমাকার, অসিৎ।

চা এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটো প্লেট্। অজয়ের মুখ দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী—একটা স্বাদালু গন্ধ আসছে চায়ের ধোঁয়ার সাথে মিশে।...তপনদেব রঙীন ঘোড়াগুলিকে আস্তাবলে তুলবার ব্যবস্থা করছেন—কাজ মিটলো বলে। পাতলা অন্ধকার অদৃশ্যছায়া ফেলেছে ঘরটার মধ্যে। এমনি অলক্ষ্যেতেই ও গ্রাস করবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে। মানুষ হয়তো ভুলেই যাবে ওরা আলোর মানুষ ছিল এককালে। নিজের অতীত মর্য্যাদা বজায় রাখতে তখন চলবে কৃত্রিম প্রচেষ্টা—যার দায়িত্ব সম্বন্ধে সদাই জাগে ভয়। বলে—প্রকৃতিকে করেছি জয়। হায়রে।

বর্ত্তমানটাই সত্য, অতীতটা মিথ্যা। পণ্ডিতরা বলেন, মিথ্যা এ-জীবন। তেমনি ওই অতীতও মিথ্যা—কারণ সে মরে গেছে। মরা অতীতকে নিয়ে আলোচনা করা মানেই মিথ্যার বেসাতি করা। তা'থেকে যা কিছু জাগুক না কেন—গন্ধ বল, রঙ বল, আর স্মৃতিই বল—সবই অর্থহীন, অচল। অতীতকে নিয়ে যারা গৌরব করে তারা

বুঝতে চায় না এই পরিবর্ত্তনশীল মরণশীল জগৎটার ধারা। মৃতের শ্মশানে বাস করে তারা দেখে মর্ম্মর প্রাসাদ রচনার স্বপ্ন। জীবনের জগতে বাস করে অতীতের পানে তাকিয়ে থাকা তাতে কল্যাণ নেই, আছে মৃত্যুর প্রেরণা। অতীত আস্ফালনের দড়ি না কাটলে মানুষের চলার পা পঙ্গু হয়েই যাবে দিন দিন। অতীত এসে করবে গ্রাস ক্ষীণায়ু জীবনকে। বর্ত্তমানকে ফাঁকি দেবার এই যে চেষ্টা, এতে আছে মরণের বিষ—অলক্ষিতে চলে তার ক্রিয়া। নিরক্ষর কলের কুলি, আধুনিক বর্ব্বর সে হয়তো বাঁচবে, কিন্তু সন্দেহ জাগে অতীত সংস্কারের দড়িতে হাত-পা বাঁধা পণ্ডিতের বেলায়। স্রোতহীন নদীর জল পরিস্কার হলে কি হবে—তলায় যে জমছে বালুর চর! ওর চেয়ে ক্ষুদ্র পঙ্কিল নির্ঝরণী ভালো, যার স্রোতের কাছে সমস্যার পাথরগুলি রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ায়।

সংস্কার ও শাস্ত্রের ঝুরো বালিতে ঠাসা আমাদের সমাজ বা সমাজের মস্তিষ্ক কালের গতিকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়! নূতনের সহ-বাসে পুরাতনের গর্ভে যে জন্ম নিচ্ছে রূপান্তরিত আগামীকাল—এ তারা বুঝতে চায় না। শুধু দিনে দিনে নিজের অলক্ষ্যে জাগছে চোরাবালির চর।

অজয় কাপ শেষ করে সোজা হয়ে বসলো। সিগারেট কেসের শ্বেতাঙ্গীরা একে একে দেহদান করেছে; নবীনার আহ্বান এল বলে। এ্যাশট্রের ছাইএর বোঝা ভারী হলো। আর বাদ বাকীটা ধোঁয়া হয়ে—গেছে উড়ে যেন মানুষের যৌবন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কইরে, কি বলবি যে বলছিলি?

হতো—ও ভাবে। ওর মন ততক্ষণ গিয়ে পৌঁচেছে জার্মেণীতে। সেখান থেকে একবার ইটালী দেশটা ঘুরে যাবে কিনা ভাবছে।

"বাবু"—বাচ্চা চাকরটা সত্যিই দেখছি কাণ্ডজ্ঞানহীন। ওকে দিয়ে আর চল্‌লো না। এত সকালে—নাঃ উঠতেই হলো। নইলে মা এসে হয়তো ঘরে ঢুকে বলবেন—রাত জেগে জেগে কলম চালাও না; মাথামুণ্ডু, ছাইপাঁশ আরো কত কি!

—চা এনেছিস্ বুঝি? লক্ষ্মীছেলে, সোনাছেলে—ওটা কি? রুটী? মা!......না, না, মাকে ডাকা সুবিধাজনক নয়। আবার সেই মাথামুণ্ডু, ছাঁইপাঁশ হয়তো এনে হাজির করবেন। কাঁহাতক হজম করি।......পাজী হতভাগা গাধা দুটো খটখটে টোষ্টও তো আনতে পারতিস্? দাঁতের চাপে পিষে খাবার আগে তবু প্রতিবাদটা জানায়... চপল পাশ ফিরে চায়ের কাপে চুমুক দেয়। ও ভাবে—বিছানায় শুয়ে শুয়ে চায়ের কাপে যে চুমুক দেয়নি, বাঁ হাতের কনুইটার ওপর ভর দিয়ে যে ধরিয়ে নেয়নি ভিজে ঠোঁট দুটোর মাঝে শ্বেতাঙ্গী সিগারেটটা—হ্যাঁ ও সিগারেটটাই বলবে হেন্‌রিয়েটার সঙ্গে মিলিয়ে—সে জীবনের আরাম উপভোগ করেনি বল্লেই চলে। সবটাই তার রয়ে গেছে বাকী। রবি ঠাকুর ধরণে কথা কটা ও একবার মনের ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এল।

নাঃ, চা' টা ঠাণ্ডা মেরে গেছে। অন্ততঃ বিছানায় শুয়ে এই উত্তাপের কিছুই সহ্য করা যায় না। বাচ্চাটাকে আবার ডাকে। সে কাছে এলে মোটা একটা কিল তার দিকে উঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে বলে—ভয় নেই, মারবো না। শীগ্‌গির ছুটে পালা, গিয়ে এক কাপ

গরম চা নিয়ে আয় দেখি। না থাকে তো মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে···বুঝলি? কি বুঝলি?···নাঃ, তোকে দেখছি···মাকে বলবি ওই একটা জিনিষ আনতে হবে দু'আনা পয়সা দাও ব্যস্। শুধু চা কি খাওয়া যায় সিগারেটা না হলে? আচ্ছা বেশ চুরুটও আনতে পারিস্ একটা মিশিয়ে।

চাকরকে চা আনতে দিয়ে চপল চাদরটা পায়ের ওপর টেনে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। ওর মনে তখন এক প্রশস্ত প্রশান্তি যেন কেমনধারা বেশ আল্‌গা গোছের।

বাইরে কাদের ডাক শুনে ও ধড়মড় করে উঠে বসলো। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখলে, অভাবনীয় ব্যাপার। মোটরে এসেছেন কয়েকজন ভদ্র লোক; অন্ততঃ সাজ পোষাকে তাই মনে হচ্ছে। চিনতে না পেরে ও অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো ওঁদের পানে।

নমস্কার! এইটাই চপলবাবুর বাড়ী?

নির্ব্বাক হাত তুলে ও বল্লে—আজ্ঞে হ্যাঁ এইটাই বটে!

তিনি কি বাড়ী আছেন? যদি ডেকে দেন তাঁকে।

চপল ভেবে পেল না তার সাথে এই সব বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের কি প্রয়োজন! খানিকটা নার্ভাস্ হয়ে বল্লে—চপলবাবু? হ্যাঁ আছেন। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলে ফেল্লে—আসুন—বসুন ভেতরে।

ভদ্রলোকগুলি গাড়ী থেকে নেমে এলেন। ওকে অনুসরণ করে এসে পৌঁছালেন ওরই ঘরে। ওঁদের ঘরে বসিয়ে রেখে কি করা যায় ভেবে না পেয়ে বারান্দায় খানিকটা পায়চারী করে এল। ফের ঘরের ভেতর এসে মশারীটা না তুলেই বসে পড়লো খাটের ওপর।

এক ভদ্রলোক কথা কইলেন—কই, চপলবাবুকে খবর দিয়েছেন ?

—এই যে—বলে ও খানিক নড়ে বস্‌লো।

—বাঃ আপনি তো বেশ লোক মশাই! আপনাকে বল্‌লাম চপলবাবুকে ডেকে দিতে—আর আপনি কিনা বেশ গুছিয়ে বসলেন আবার! উনি কে হন আপনার ?

আজ্ঞে···এই হন···মানে···

কেউ নয়, কেমন তো ?

অপর একজন বললেন—তা নাও হতে পারে, মৃণালবাবু। হয়তো কোন পরিচিত; দুদিন বেড়াতে এসেছেন—তাই বাড়ীর কাউকে বিশেষ চেনেন না। কেমন ঠিক বলেছি তো ?

চপল ক্রমশঃ আরো নার্ভাস্ হয়ে পড়তে লাগলো।

মৃণালবাবু ওর দিকে বাঁকা করে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কবিতার সুপারিশ্‌ নিতে এসেছেন বুঝি ? আরে মশাই মেজে ঘষে কবি কি তৈরী করা যায় ? কবি দৈবাৎ জন্মায়।

—এই দেখুন···মানে···দাদা আসছেন ; বাবাঃ বাঁচা গেল—বলে চপল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দাদা এসে ঘরে ঢুকলেন ; পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, ফিট্‌ফাট্ মানুষ। আড়ম্বর নেই, অমনোযোগও নেই। দাদাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মৃণালবাবুরা উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন—নমস্কার, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমরা।

ওর দাদা প্রতিনমস্কার করে চিনলেন না কাউকেই। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন! কি প্রয়োজন বলুন। আপনাদের কাউকে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।

কি করে আর চিনবেন বলুন? আপনাকে কিন্তু আমরা খুবই চিনি? শুধু আমরা কেন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় মাত্রই চেনে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য ক'জনের হয় বলুন? আপনি তো কোথাও বেরুন না শুনেছি, তাই নিজের গরজেই এসেছি বহু কষ্টে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করে। পর্ব্বত মহম্মদের কাছে না গেলে মহম্মদকেই পর্ব্বতের কাছে আসতে হয়, বুঝলেন্ না—বলে মৃণালবাবু মৃদু হেসে উঠলেন।

মৃণালবাবুর পার্শ্বচর কথা কইলেন—আচ্ছা উনি আপনার কে হন বলুন তো?

—কার কথা বলছেন বলুন তো?

তৃতীয় জনের পালা সুরু—ওই যে, যিনি এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। কবিতার সুপারিশ্ নিতে এসেছেন তো?

দাদা বল্লেন, তা, কেন? ও তো আমার ছোট ভাই।

মৃণালবাবু একটু বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করে বল্লেন—ভাই! আপনার ভাই এতবড় একটা গৌরবের পরিচয় উনি প্রকাশ করলেন না যে? ওঁর মাথায় কি কিঞ্চিৎ ছিট্ আছে?

দাদা হেসে বল্লেন—ও হতভাগা অমনি পাগল। বাস্তব সংসারের কিছুই ওর ধাতস্থ হয় নি। এই ঘরের মধ্যেই থাকে সারা দিনরাত। মা এত বকেন, বলেন—হতভাগা ছেলে বাইরে কোথাও একটু বেড়িয়ে আয়তো দেখি। কিন্তু কে কার কথা শোনে। রাতদিন বসে আছে বই পত্তর আর কাগজ কলম নিয়ে।

মৃণালবাবু চোখটা ঈষৎ তুলে বল্লেন—পড়াশুনোয় চাড় থাকা

ভালো, বুঝলেন। কোন্ ইয়ারে পড়ে, সেকেণ্ড ইয়ারে বুঝি ? তবে সেই তুলনায় বয়স একটু বেশীই হয়ে গেছে, এই যা। যাক্, আর দুটো বছর বাদে বি-এ টা দিয়ে ফেলতে পারলেই আর কেউ নাক কুঞ্চিত করবেনা।

ওর দাদা বলেন- কলেজ কোথায়! কলেজের পালা ও বহুদিন চুকিয়েছে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মৃণালবাবু বল্লেন—ও! তবে বুঝি চাড্ডি রাবিশ্ নাটক নভেল পড়ে ? তারপর বেশ একটু গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করে বলেন—আর দোষই বা কি বলুন। বাজারে যে সব নভেল বেরুচ্ছে তাতে যুবকদের মস্তিষ্ক গয়া। কি থাকে সে সব বইতে বলুন দেখি। কোনলেখক যদি আজগুবি একটা কিছু লিখে হঠাৎ নাম করে ফেল্লে তো ব্যস্; কুড়ি দরে ছাই পাঁশ লেখা শুরু হলো। পাঠকরা শুধু লেখকের নাম দেখেই আত্মহারা। কবে একবার কি দিয়ে ভাত খেয়েছিল—তারি হাত শুঁকে জীবন কাটান, হোপ্‌লেস। সেই একঘেয়ে প্রেমের কাঁদুনী আর ন্যাকামো। আপনিই মাত্র নিয়েছেন অন্য রাস্তা। আপনার লেখা পড়লে বুঝতে পারি প্রতিপাদ্যটা কি, কোন মুখী তার ধারা। আর দু একজন ছাড়া বাদবাকী সব ধোঁয়ার কারবারী—ফুলঝুরি কারখানার কারিগর, পদার্থ কিছুই থাকে না লোক-হাসানো ছাড়া। সত্যিই আপনার ধারা দেশে নতুন স্রোত আনবে। তাই তো এসেছি আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ধন্য হতে, আর আমাদের "মিলনীকেও" সার্থক করতে।

দাদা এতক্ষণে বুঝতে পারলেন যে, ওঁরা চপলের কথাই বলছেন, তাই উনি জিজ্ঞাসা করলেন—কার কথা বলছেন আপনারা ?

দেখুন, বিনয় আপনার মত গুণী লোকের ভূষণ। তবু আবেগকে চেপে রাখা যায় না সত্য সত্যই থাকে শ্রদ্ধা বা ভালবাসা। নিজের প্রশংসা একেবারে সামনাসামনি শুনতে বোধহয় কেউ ভালবাসেন না। তবু যা বলেছি তা আমাদের অন্তরেরই কথা। দোষ করে থাকি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ওর দাদা হাসতে হাসতে বল্লেন, আপনারা গোড়াতেই ভুল করেছেন আর মাঝখানে এসে পড়ে আমিও জড়িয়ে গেছি সে ভুলের মধ্যে। এখন বুঝতে পেরেছি আমার ভুলটা, তাই আপনাদেরও উদ্ধার করতে চাই।

বলুন! আমাদের তথা সারা দেশের ভুল শোধরাবার ভার আপনাদের হাতে দিয়েই পাঠিয়েছেন ভগবান।

ঠিক তাই নয়—ওর দাদা বল্লেন। ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটীল হ'য়ে উঠছে, শেষকালে আপনারা ও জিভ্ কাটবেন, আর আমাকেও অপদস্থ হতে হবে আপনাদেরি কাছে।

সেকি? কি বলছেন আপনি? মৃণালবাবু বল্লেন।

বলছি কি আপনারা যার কথা বলছেন, বা যার সাথে দেখা করতে এসেছেন তার নামতো স্বনামধন্য চপলবাবু?

আজ্ঞে হঁ্যা, অর্থাৎ আপনার সাথেই…

দাঁড়ান. এত শীঘ্রই চিনে ফেলবেন না চপলবাবুকে।

তার মানে?

তার মানে এই যে—সে এতক্ষণ বসেছিল আপনাদের সামনেই, অর্থাৎ যাকে বল্লেন ছিট্ আছে, মানে যে ব্যক্তি আমার কাছে কবিতার সুপারিশ নিতে এসেছে কি না জিজ্ঞাসা করছিলেন, দ্যাট্ ইজ্—যাকে

সেকেণ্ড্ ইয়ারের ছাত্র বানিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেল্লেন, তিনিই চপল বসু অর্থাৎ যার আসনে আমাকে বে-আইনী করে বসিয়ে সুখ্যাতি করছিলেন। আমি তার অখ্যাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাত্র।

মৃণালবাবু ও তাঁর দলটী চোখদুটীকে বিস্ময়ের কোণে তুলে বল্লেন —এঁ্যা, বলেন কি!

ওর দাদা বল্লেন—মানে ছি, ছি, কি লজ্জার বা দুঃখের কথা, অথবা তিনি কি মনে করলেন, এই তো? অভয় দিচ্ছি, এসব দিকে খেয়াল ওর কোন কালেই নেই। লোকজন দেখলে গুলিয়ে ওঠে ওর মগজ, তাই উত্তর প্রত্যুত্তরের পালাটা কেটে ছোট করে আনতে চায় এলোমেলো কথার তরবারি চালিয়ে। বাস্তবের দিকে একটু হুঁস্ যদি ওর থাকতো তাহলে তো আমার মগজ অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য পেত।

মৃণালবাবু বল্লেন (ওঁর দল তখন বিস্ময়ের পারদস্তম্ভ নীচুর দিকে নামাবার চেষ্টা করছে) —দেখুন তো কি ভুলই করে বসলাম। প্রথমে তো ওঁকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এটা চপলবাবুর বাড়ী কিনা এবং তিনি আছেন কি না। উনি 'হ্যাঁ আছেন' বলে ভেতরে নিয়ে এসে বসালেন। তখন পরিচয় না পেয়ে মনে করলাম, চপলবাবুর খোঁজ করছি অর্থাৎ ওঁকেই চাইছি এ কথা উনি বুঝবেন।

অত সোজাসুজি যদি ও বুঝতে শিখতো তাহলে তো ভাবনাই ছিল না। চপলবাবুর বাড়ী জিজ্ঞাসা করেছেন, ও সোজাসুজি চপলবাবুর ঘরে এনে বসিয়ে প্রত্যুত্তরের দৈর্ঘ্যকে কমাতে চেয়েছে। যদি জিজ্ঞাসা করতেন—আপনার নাম কি চপলবাবু? ও তাহলে সংকুচিত হয়ে দাঁড়াতো—যেন 'চপল' এই নাম ধরে ও ভয়ানক এক অপরাধ করে

বসেছে। আপনারা ঘুরে গেছেন, আর ওর অসামাজিক তরোয়ালট আপনাদের দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে। থাক্ এত ভাববার কিছুই নেই। আপনারা বসুন, আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি --বলে দাদা বেরিয়ে গেলেন।

মৃণালবাবুদের অবস্থা তখন ঠিক স্বাভাবিক নয়। কি ভাবে কথা বলে এই অভাবনীয় ত্রুটীর ব্যবধানটাকে পুরণ করবেন সেই কথাই ওঁরা আলোচনা করতে লাগলেন।

চপল এর মধ্যে দরজার কাছে এসে হাজির। বোধহয় দাদার তাগিদেই জামা কাপড়টা বদলান হয়েছে। চায়ের পেয়ালা শুদ্ধ চাকরটাকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে—একটু চা খান, মা পাঠিয়ে দিলেন। আর এই সিগারেটগুলো। হঁ্যা, দ্বিতীয় দফাটী কিন্তু মা পাঠিয়ে দেন নি। মিথ্যা কথা বল্লে মা শুনতে পেলে ভয়ানক হয়ে করবে—বলে ও ঈষৎ হেসে নিজের পরিত্যক্ত শয্যায় চেপে বসলো।

মৃণালবাবুর দল তখন উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করেছেন—দেখুন, গোড়াতেই ভয়ানক ভুল করে বসেছি; ক্ষমা চাই। ইংরাজীতে বল্লেন—'ভুল করাই মানুষের স্বভাব'। ছি ছি, কি লজ্জার কথা বলুন দেখি! আপনাকে চাইতে এসে আপনাকেই দিলাম তাড়িয়ে আপনা-রই ঘর থেকে!! গলায় চাদর জড়ানো এক পার্শ্বচর সুযোগটা ছাড়লেন না—এ যে সোনা ফেলে আঁচলে তুই বাঁধলি গেরো হায়রে হায়। কেমন তাই নয় কি?

মৃণালবাবু চপলের হাসিকে অনুসরণ করে বল্লেন—সত্যি, একটুও বুঝতে পারি নি যে, আপনিই উদীয়মান জ্যোতিষ্ক

সাহিত্যিক চপল বসু। মনে করেছিলাম আমাদের দেশের সকল কবি মায় কালকের সরস্বতী পূজার গান লেখক পর্য্যন্ত যেভাবে চলেন বলেন, চপল বসু এতখানি যশ, সম্মান ও সম্ভ্রম আদায় করে তাদের লবঙ্গ-লতিকা ভাবকে নিশ্চয়ই দুরন্ত ক'রে ফেলেছেন। কবিদের গায় সার্ট কোট উঠতে দেখিনি। মুস্কিল আশানের পরিধেয় পদ-বাচ্য পাঞ্জাবীর ভেতর শীর্ণ বাহু গলিয়ে গলায় জড়িয়ে চলেন চাদর। মনে হয় ফ্রিল দেওয়া মোটা বালিশের খোলের ভেতর ঢোকান হয়েছে খোকার পাশ বালিশ। তাই আপনাকে যখন দেখলাম ছেঁড়া গেঞ্জীর ওপর একটা কোট চাপিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, তখন আমাদের পথে-ঘাটে-দেখা কবিগুলির সাথে আপনার ছবির কোন মিল খুঁজে পেলাম না। ওখানে করলাম ভুল। খেয়াল করি নি—(ইংরাজীতে) 'হে হোরেসিয়ো, এই পৃথিবীতে এমন বহু জিনিষ আছে যাহা আপনকার দর্শনশাস্ত্র স্বপ্নেও ভাবতে পারে না'। ধারণাই করতে পারিনি আপনিই তিনি, যাঁর বিষয় আমরা মনে মনে কত কল্পনাই না করেছি। অপরাধ আছে চপলবাবু, তার ক্ষমাও আছে, বিশেষ করে আপনার মত দরদীর কাছে।

চপল দাদার কথা মত নিজের মগজকে শক্ত করবার চেষ্টা করে বল্লে—দেখুন, আমারো যেন কেমন ভুল হ'য়ে গেল, তাইতো নিজেও খানিকটা লজ্জায় পড়ে গেছি।

মৃণালবাবুরা ভেবেই পেলেন না—চপলের লজ্জার কারণ কি থাকতে পারে। নিজেদের লজ্জার কথা ভেবেই ওরা তখন প্রায় ঘেমে উঠেছিলেন। তাই চপলের কথা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে কথার

মোড় ফেরাবার চেষ্টা করলেন—যেতে দিন। যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এ রকম লজ্জায় আমি কোনদিন পড়িনি। থাক্ সে কথা। এখন যে আর্জ্জি নিয়ে আপনার কাছে আসা তাই পেশ করি। তারপর পকেট থেকে একটা রঙীন কার্ড বের করে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—আমাদের "মিলনী" হচ্ছে সাহিত্যালোচনার একটা প্রচেষ্টা বলতে পারেন। আপনাদেরি লেখা নিয়ে আলোচনা করি। পরশু তার পূর্ণিমা সম্মেলন। সে উৎসবে আপনি হোতার আসন গ্রহণ করবেন এই আমাদের একান্ত কামনা। মিলনীর সকল সভ্য ও সভ্যাই আপনার দর্শন কামনায় উন্মুখ—তাঁদের চাওয়া আপনাকে পূর্ণ করতেই হবে, চপলবাবু। ধন্য হব আমরা, ধন্য হবে আমাদের মিলনী। আপনার এতগুলি গুণগ্রাহীকে বঞ্চিত করতে পারবেন না কোন প্রকারেই। তাই যেতে আপনাকে হবেই।

চপল এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল ওদের কথা। মুহূর্ত্ত মধ্যে ও ভেবে নিল নিজেকে সভার পুরোহিতরূপে—ভেবেই পেল না ও সেখানে গিয়ে কি করবে। তাই বিনীত দৃষ্টি ফেলে বল্লে—দেখুন, আমি···

মৃণালবাবু ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লেন—দেখুন, টেখুন এর ভেতর কিছু নেই, চপলবাবু। আমরা আপনাকে চাই, আমরা আপনার আলোকে প্রভান্বিত হতে চাই—এইই আমাদের সব থেকে বড় অধিকার। আর সেই অধিকার বলেই আমাদের উৎসাহ ও ব্রত উদযাপনের পক্ষে যথেষ্ট। তাতেই আমরা ধন্য হব, সার্থক হবে আমাদের "মিলনী"। কোন কষ্টই আপনার হতে দেব না সে ভার আমি নিজে নিচ্ছি।

চপল হেসে বল্‌ল—আমি তা বলছি না, মৃণালবাবু। আমি বলছিলাম কি—যে আমি সেখানে গিয়ে করবো কি? বক্তা আমি নই। অন্তরে যা অনুভব করি, নিজের নিরালা ঘরের কোণে বসে তাই অক্ষরের আকারে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করি। মুখের কথায় তাকে প্রকাশ করবার ভাষা হয় তো জুগিয়ে উঠবে না সে সময়। যে আশা আপনারা আমার কাছে করছেন তা না পেয়ে হয় তো নিরাশ হবেন।—তখন হয় তো অশ্রদ্ধাই জাগবে মনে।

—কি যে বলেন! যাঁর লেখার ওপর আমাদের এতখানি শ্রদ্ধা—সেই মানুষটীকেই করবো অশ্রদ্ধা!

—তাই হয় মৃণালবাবু। মানুষ যখন মনে মনে আশার সৌধ রচনা করে চলে তখন হিসাব রাখে না কল্পনার স্রোত কতখানি ছড়ালো। তারপর বাস্তবের চোখ দিয়ে যখন দেখে—কল্পনার ধারা শুকিয়ে গিয়ে জেগেছে নিরাশার চর অপূর্ণতার বালিতে ভরা—তখন তাদের মন হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণ, মনে জাগে অশ্রদ্ধার ভাব। অবশ্য আমি এ কথা বলতে চাইছি না যে, তাতে মানুষের কোন দোষ আছে। স্বভাবই তার এই ধাতুতে গড়া। আমাকে নিয়ে গিয়ে আপনাদের নিজের কথারই পুনরাবৃত্তি হয় তো করতে হবে—সোনা ফেলে আঁচলে তুই বাঁধলি গেরো হায়রে হায়। আমার চেয়ে বহু যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন—তাঁদের কাউকে এ সম্মান দিলে আপনার চাওয়া পাওয়ার নাগাল ধরতে পারবেন, মৃণালবাবু।

—তা হয় না, চপলবাবু। পাওয়াটাই হবে সব, আর চাওয়াটা কিছুই নয়? চাওয়াটাই যে পাওয়ার সবখানি পাওয়া সে কথা তো

আপনাকে বোঝাতে হবে না। বলেছি তো আপনার উপস্থিতিই আমাদের আশা-পূরণের পক্ষে যথেষ্ট।

—অনেক কিছুকেই প্রথমে যথেষ্টই মনে হয়নি জানি। আবার এও জানি যে, সেই যথেষ্টই পরের যথেষ্টকে পাবার জন্য পর মুহূর্ত্তেই সচেষ্ট হয়। কেন অনর্থক যথেষ্ট মরীচিকার পাল্লায় পড়ে অতিষ্ট হয়ে উঠবেন। এ আমার বিনয় বলে ভুল করবেন না, কারণ আমি জানি অতি বিনয় অবিনয়ের চেয়ে ভয়ঙ্কর।

—আপনি মরীচিকাই, চপলবাবু—দূর থেকে মনোহরণ করেন, ধরে পাওয়া যায় না। কিন্তু নাগাল যখন পেয়েছি, নাকাল আপনাকে করবোই। শুনুন,—কুমারী মীরাদেবী, যিনি আপনার অন্ধ ভক্ত দেবতার নাগাল না পেয়েও……

চপল ওঁর কথার মধ্যেখানেই বল্‌ল—কিন্তু অন্ধ ভক্তি কি ভালো? তার চেয়ে অভক্তিকে সহজে বোঝা যায় আর তা মারাত্মকও কম।

ওঁরা সকলেই হেসে উঠলেন—অন্ধের চোখ ফোটাবার জন্যই তো আপনার আহ্বান এলো। উনি করবেন আবৃত্তি, আপনারি কবিতা—"মাটীর মরতে"। আরো আশা দিয়েছেন, যে আপনার উপস্থিতির প্রেরণা পেলে শোনাবেন আপনারই লেখা গান—"শিখা"। আপনার ভাব অপরের কণ্ঠে কেমন রূপ পায় সে তো আপনার দেখা উচিত।

এমন সময় চাকরটা এসে খবর দিল—মা ডাকছেন। চপল 'এক্ষুণি আসছি' বলে উঠে গেল। ওরা বসে রইলেন, মুখে সাফল্যের আনন্দ।

চপল ধীরে ধীরে মা'র কাছে এসে দাঁড়ালো জিজ্ঞাসুদৃষ্টি মেলে।

মা বল্লেন—হঁ্যা রে, কাণ্ডজ্ঞান কি তোর কোন কালেই হবে না?

চপলের চোখ থেকে জিজ্ঞাসার চিহ্ন উঠে গিয়ে আগম হলো বিস্ময়ের চিহ্নের—বাঃ, আমি কি করলাম!

—কিছু কর না বলেই তো বিপদ। কিছু করতে শিখলে তো বাঁচতাম।

চপল ভেবে পেল না ইতিমধ্যে কি অন্যায় ও করে বসলো। মাকে বল্লে—কিছু অন্যায় করেছি কি?

—নিশ্চয়ই করেছিস্। মান সম্ভ্রম কি ডোবাবি নাকি আমাদের?

ও হাঁ করে মা'র পানে চেয়ে বল্লে—আমি!

—হঁ্যা, হঁ্যা তুই। মুখ্যু কোথাকার। এতগুলো ভদ্রলোকের ছেলে যে সেই থেকে বসে আছেন তোর বাড়ীতে, তা তোর খেয়াল নেই?

হতবম্ভ হ'য়ে বল্লে—বারে! আমি কি করবো তার? ওরা এলেন কেন; আমি সেধেছিলাম? যাচ্ছি, এক্ষুণি চলে যেতে বলছি।

মা চোখদুটী বিস্তৃত করে বল্লেন—দেখ ছেলের বুদ্ধি! তোকে নিয়ে আর চলে না, চপল। আমি বুঝি ওদের তাড়িয়ে দিতে বল্লাম তোকে?

—তবে কি বলছো?

—বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। কিছু বুদ্ধি যদি তোর হলো এতদিনেও! গাধা কোথাকার।

ও নিরতিশয় বিস্ময়ে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

মা হেসে উঠে বল্লেন—তুই একটা প্রকাণ্ড গাধা, বুঝলি ?

চপল ঘাড় নেড়ে বল্‌ল—উঁহুঃ, বুদ্ধি তো আমার নেই, তা বুঝবো কি করে ?

—এদিকে বুদ্ধি তো বেশ আছে দেখছি। মানুষের মত দেহ হলে কি হবে, আমার পেটে তুমি একটা গাধা এসে জন্মেছ। একটা ল্যাজ্‌ যে ভগবান তোকে কেন দেন নি ভেবে পাই না।

চপল গাম্ভীর্য্য রেখে বলে—তা হলে ল্যাজ্‌ আর কাপড় এক সঙ্গে সামলাতাম কি করে বল ?

—ল্যাজ্‌ একটা তোর ছিল গত জন্মে, এ জন্মে কোন রকমে তা চলে গেছে। তা নইলে এতগুলো ভদ্রলোকের ছেলে সেই কখন থেকে বসে আছে তোর বাড়ীতে—আর তুই কিছু জলখাবারও এনে দিলি না তাঁদের জন্যে ?

চপল এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো—ও, তাই বলো মা ! কিন্তু আমি কি জানি তার ?

—তা জানবে কেন ? খালি জান চা আর কাগজ কলম। এখন যা দেখি—ওরা একলা বসে আছেন। উঠতে দিবি না এক্ষুণি, বুঝলি ? কজন এসেছেন বল্‌তো ?

ও আঙুল গুণে বল্লে—চার আর একজন—পাঁচ।

—আর একজন কে ?……পেটুক মহারাজ তুমি ?

ও ততক্ষণে সরে পড়েছে। ঘরে ঢুকে ওদের দিকে তাকিয়ে বল্লে—দেখুন, আপনাদের এক্ষুণি উঠে যেতে মা মানা করলেন।

ওঁরা সমবেত কণ্ঠে বল্লেন—কেন ? বড় দেরী হয়ে গেছে যে।

মাকে বলবেন তাঁর স্নেহাশ্রয়ে আর একদিন আসবো—বলে ওঁরা উঠতে চাইলেন।

চপল মুস্কিলে পড়লো—দাঁড়ান একটু ; মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি তাহলে।

ওরা এই অদ্ভুত লোকটীর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

ইতিমধ্যে চা আর জল খাবার নিয়ে চাকর ঘরে ঢুকলো। চপল প্লেটে চারটে মার্ব্বল-চপ টেবিলটায় সাজিয়ে দিয়ে বল্‌ল—আপনারা ততক্ষণ মা'র আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হোন—আমি আসছি এক্ষুণি।

ও সটান মার কাছে গিয়ে হাজির হলো। মা'র দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে বল্‌ল – কই ?

—কি কইরে ? সবই তো পাঠিয়ে দিয়েছি।

—ঘোড়ার ডিম দিয়েছে। তোমার যদি একটু স্মৃতি শক্তি থাকে, মা। নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

—অবাক্ করলি, কি হলো তাই বল্ ?

—আমার প্লেট কই ?

—ওরে রাক্ষুসে ছেলে তাই এসেছিস্ ছুটে ?

—বারে, সেই সকাল থেকে আমি খেয়েছি নাকি কিছু ?

—খাস্‌নি ? চা রুটী খেলে কে ?

—রুটীকে বুঝি খাবার বলে ? আর চার চারটে লোকের সঙ্গে যে এতক্ষণ বকলাম তা বুঝি টের পেল না ?

—নে, নে পেটুক কোথাকার ; রান্না ঘরে আছে দেখগে।

প্লেটটা নিয়ে ও চলে আসে ওর ঘরে। ওদের খাওয়া ততক্ষণে

সারা হয়েছে—আভিজাত্যের খাওয়ার ধারা। ওকে দেখেই ওরা উঠে দাঁড়ালেন, নমস্কার করে বল্লেন—আজ আসি তাহলে ; পরশু কিন্তু ছাড়বো না আপনাকে।

—আচ্ছা বলে—চপল ওদের এগিয়ে দিতে চললো।

—বিকাল চারটায় আসবো পরশু।

—আসতে আপনাদের হবে না। আমি নিজেই যাবো যখন কথা দিয়েছি। কার্ডে ঠিকানাটা লেখা আছে তো? আমার নামটা ওতে আগে থাকতেই লিখে বসে আছেন দেখছি।

—ওটা আমাদের পলিসী চপলবাবু এবং এও প্রমাণ যে আপনাকে না হলে আমাদের চলবে না—বলে হেসে ওরা মোটরে উঠলেন। চপল অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

সঙ্ঘ গ্রন্থাগার (স্থাপিত ১৩৫১ সাল)

চতুর্থ পর্য্যায়

কিছুক্ষণ বাদে ঘরে ঢুকে বিছানায় পা ছড়িয়ে ও শুয়ে পড়লো। ওর চোখের সম্মুখে তখন হাসছে মৃণালবাবুর চেহারাটা। মোটা সোটা চেহারা—স্বাস্থ্যের আধিক্যের পরিচায়ক অথবা আহারের। রঙ্‌টা বিশেষ ফর্সা না হলেও মেজে ঘসে পালিশ্‌ করা। অদ্ভুত পোষাক—ফিন্‌ ফিনে ধুতির ওপর অভিনব ফ্যাসানের আদ্দির সার্ট। রঙীন জুতো—মেলাই কুঁচো চামড়ার জাল বোনা। গলায় টাই করে বাঁধা একটা রঙীন রুমাল। হাতে গোটা তিনেক আংটী পাথর বসানো। নাকে শোভা পাচ্ছে রিম্‌লেশ্‌ চশ্‌মা। ছোট্ট সোনার ঘড়িটা বাঁকা করে হাতে বাঁধা। চলেন বলেন টেনে টেনে। ওর ভারী মজা লাগে এই অদ্ভুত লোকগুলিকে দেখতে। আবার ভাবে—কি জানি হয়তো বা কেউ কেটা হবে! বাইরে থেকে তাইতো মনে হওয়া উচিত। মরুক্‌গে—যে আছে বড়লোক সেই আছে, ওর কি? ও পাশ ফিরে শোয়।

অন্য ভাবনা আসে চোরা জলের মত।···তাই তো কি বলা যাবে ওদের ওখানে গিয়ে? নাঃ মনের স্বাচ্ছন্দ্য এরা হরণ করলে দেখছি। আবার ভাবে কি বলতে হবে—না পড়তে হবে। না লিখে—নিয়ে গিয়ে অভিভাষণ পড়া ওর দ্বারা হবে না। ও অভ্যাস যেন বিশ্রী অশোভন। বড় বড় অনেক রথীরাই করে থাকেন, তবু ও নিজে তা পারবে না।

সাহিত্যিকের মন সর্ব্বদা বহমান। কাগজের পাতায় তাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়াতে ঘৃণা জাগে। চপল ঠিক করে ফেলে—ওর মনে যা আসবে ও তাই বলবে তখন। সীমানির্দ্দিষ্ট ভাবকে কোন ক্রমেই ও সহ্য করতে পারে না—না কিছুতেই না। কিন্তু কি বলবে সে? সাধারণ লোকে যেমন দুবার কেশে চার বার চাদর নেড়ে বলে—ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাবৃন্দ? এঃ, ওর মন সায় দেয় না—বাঁধা ধরা পথে পা বাড়াতে। যাক্ সেখানে গিয়েই ঠিক করে ফেলা যাবে। আগে থাকতে ভেবে খালি মনকে অসুস্থ করে তোলা।

চপল উঠে দাঁড়ায়। নিঃশেষিত পেয়ালাগুলির দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টি ফেলে একটা চুরুট ধরিয়ে নেয়। ও ভাবে—নাঃ সিগারেটটার চেয়ে চুরুটের আভিজাত্য আছে বেশী—মাদকতাও—বনেদী বংশের মেয়ের মত একটা বিশেষত্ব—লোককে ফিরে তাকাতেই হয়। হাল্কা হাওয়ার লঘুপক্ষ প্রজাপতি নয়—ধরতে না ধরতেই যার পাখা পড়ে না খসে, সৌন্দর্য্য যায় না মিলিয়ে। ময়ূরের মিহি রব নেই, তবু তার দিকে লোকে প্রশংসমান্ দৃষ্টি মেলে দেয়। পাখা তার খসিয়ে দেয় নতুন করে গজাবে বলে—আবার নতুন করে বাড়ে তার মর্য্যাদা। তাই তো চপল মাঝে মাঝে ধরায় চুরুট-সিগারেটের বদলে, ক্ষণস্থায়ী যার মোহ। বয়স তার খুব বেশী নয়, তাই যেন কেমন একটু দেখায়—বাইশ বছরের কবির বত্রিশ্ বছরের প্রিয়ার মত।

ভাবতে ভাবতে চপল রাস্তায় নেমে আসে। উদ্দাম জনস্রোত—ও যেন দিশা হারিয়ে ফেলে! এর প্রাণের স্তরে স্তরে যেন এক নতুন আনন্দের ধারা বয়ে চলেছে—স্থির জল থেকে বহমান জলে এসে

মাছের যা আনন্দ। ও যেন আজ মুক্তি পেয়েছে বদ্ধ কারাকক্ষ থেকে। বাস্তবিক, বাইরে কত বিচিত্র জীবন, অভিনব উদ্দীপনা—ও চোখ মেলে চায়নি এদের দিকে। রাস্তায় রাস্তায় ও খানিকটা ঘুরে বেড়ায় আপন খেয়ালের বশে, তারপর ফিরে এসে আপন ঘরটাতে অনেকক্ষণ পরে। বেলা তখন বেজে গেছে একটা। ঘরে ঢুকে ডেক্ চেয়ারটাতে ও গা মেলে দেয়।

পায়ের শব্দ পেয়ে ওর মা ঘরে ঢুকে দেখেন ও চোখ বুজে পড়ে আছে। খাওয়া দাওয়া এখনো হয়নি, স্নানও নয়। কাছে এসে বলেন –হতভাগা ছেলে, এতক্ষণ ছিলি কোথায়? খেতে দেতে হবে? না, তাও ভুলে বসে আছ?

চপল ধড়মড় করে উঠে বসলো। বাস্তবিকই, এখনো তো ওরই স্নান হয় নি, খাওয়াও নয়? মা হয় তো বসে আছেন ওরই প্রতীক্ষায়। অপরাধীর মত সংকুচিতভাবে ও উঠে দাঁড়ায়।

মা জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় গিয়েছিলি রে?

—এই একটু ঘুরে এলুম মা।

—এই দুপুরে আবার কি দরকার পড়েছিল শুনি?

—এই এমনই গেলাম বেড়াতে—বেশ ভাল লাগছিল যে।

—শোন কথা একবার। সময় আর উনি পেলেন না; বেড়াতে বেরুলেন দুপুর বেলায়। তোর কি সবই অদ্ভুত রে?

ও অপরাধীর মত বলে –আর কখনো যাবো না, কেমন?

—দুপুরে কি মানুষ বেড়ায় পাগ্‌লা কোথাকার—স্নেহের স্বর ঝরে পড়ে মায়ের কণ্ঠ হতে—বলি, সকালে উঠে একটু বেড়িয়ে আয়, তাতো

শুনবি না। দুপুর রোদ্দুরে মুখখানা কি হয়েছে একবার দেখতো আয়নায়। নে, চল স্নান করে নিয়ে দুটো খাবি চল।

চপল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। স্নান সেরে নিয়ে রান্না ঘরে এসে বলে—ভাত দিয়েছো মা ?

মা ওর দিকে তাকিয়ে বলেন—গায়ের জলটা একট মুছতেও তো হয় বাপু। ওই রকম জল শুদ্ধ থাকলে শেষে যদি অসুখ করে তো দেখবে কে বল ? আমি তো বাপু একলা মানুষ। বৌদি তোমার বাপের বাড়ী আদরে আছেন। মা নিজেই আঁচল দিয়ে ওর পিঠের জল মুছিয়ে দেন। ভাতের থালা আগিয়ে দিয়ে নিজে পাশে বসেন।

চপল জিজ্ঞাসা করে—তোমার খাওয়া হয়ে গেছে তো ?

ওর মা বলেন—শোন কথা, উনি রইলেন বাইরে, আর আমি নিলাম খেয়ে !

—বাঃ, খাওনি কেন ? এ তোমার ভারী অন্যায়।

মা মৃদু হেসে বলেন—তাকি খেতে আছেরে ? ছেলের খাওয়া না হলে মায়ের কি ক্ষিদে পায় ? এই দেখনা তোর ঠাকুরমা—চাকরটার খাবার সময়েও তিনি পাশে বসে থাকেন। চাকরী করতে এসে তারা পেত মাতৃ-স্নেহ—তাই এ বাড়ীতে যে একবার আসতো তাড়িয়ে দিতে গেলেও সে যেতে চাইত না। তোর ঠাকুরদা যদি কখনো বকতেন কাউকে, ওঁর প্রাণে গিয়ে বাজতো সে আঘাত। ভেবে পেতেন না কি বলে তাকে সান্ত্বনা দিবেন। তিনি ছিলেন দেবী। আমি তাঁর অসীম গুণের শতাংশও পাইনি, বাবা। আমাদের দেশের মায়েদের এইটাই ছিল চিরন্তনী ধারা। সে সব দেবীরা আজ কোথায় যেতে

বসেছেন ভাবলেও কান্না পায়—ওর মায়ের চোখ সজল হ'য়ে ওঠে।

চপল অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে—আচ্ছা মা, আমি যদি আজ না ফিরতাম, তাহলেও তুমি খেতে না?

মায়ের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠে—তাকি হয়রে বোকা-ছেলে? এতকথা জানিস্ আর এ কথাটা জানিস্না যে সন্তানের প্রাণ মায়ের নিজের প্রাণের চেয়ে বড়। তুই অনাহারে বাইরে থাকলে আমি কি খেতে বসতে পারি, না মন চায়? বাইরে তুই কোথায় কি ভাবে রইলি তাই ভেবেই কুল পেতুম না, তা আবার খাওয়া।

—আচ্ছা, আমি যদি আর একেবারেই না আসতাম?

—ও কথা বলতে নেই বাবা, মায়ের মনে ব্যথা লাগে। তোরা নির্ব্বিঘ্নে খেয়ে খেলে বেড়াচ্ছিস্—এই দেখতে দেখতেই যেন জীবন যায়। তাতেই আমার স্বর্গলাভ হবে—এ আমি নিশ্চয় জানি।

চপল ভারী লজ্জায় পড়ে। হাতের ভাত আর মুখে উঠতে চায় না। ও যেন ভারী অন্যায় করে ফেলেছে। মায়ের মনে ক্ষণিক ব্যথা দিয়ে ও নিজেই ব্যথাহত হয়ে পড়ে।

ওর অবস্থা উপলব্ধি করে মা কথার মোড় ফিরিয়ে বলেন—খাওয়া বন্ধ করলি যে? তুই দিন দিন নিতান্ত ছেলেমানুষ হয়ে পড়ছিস্, চপল। খেতে বসে হাঁ করে ভাবতে থাকবি; স্নান করতে বল্লে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বি—এসব কোন ধারা? এমনি করে কতদিন চালাবি বল দেখি? একটু কাজের মানুষ হ'তে শেখ, না চিরটা কাল দাদার ঘাড় দিয়ে চালাবি? তাকি ভাল দেখায়, না উচিত? সত্যি বলছি চপল, একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা কর। বই লিখে কিইবা দেয় ওরা। আজ

যদি তোর দাদার চাকরী যায়, সংসার কি করে চলবে বল দেখি? ব্যাঙ্কে যে সামান্য কিছু আছে তাই ভেঙে খাবি তো?

চপল স্থির হয়ে শোনে। সত্যিইতো, এমনি করে চিরদিন চলবে কি করে? সুনাম হয়তো যথেষ্ট পেতে পারে। অভ্যর্থনা ওকে হয়তো অনেকেই করবে—কিন্তু তা দিয়ে কি সংসার চলে? তা দিয়ে কি মার দুঃখ ঘোচান যায়? ও ভাবে, কিন্তু ভেবে কিনারা পায়না। দিগ্বিজয়ী হবার বাসনা ওর। সাহিত্যকে ও সাধনা বলে গ্রহণ করেছে—সাধকের দারিদ্র্য চিরন্তনী। তবু মনে খোঁচা লাগে। ও ভাবে—ভাবতে ও শিখেছে, আর কিছুই শেখেনি। আজকাল মাসিকে লেখা দিয়ে কিছু কিছু মেলে, কিন্তু তাতে নিজের খরচ কুলোনোই দায়। দাদার স্নেহাশ্রয়ে ও নিশ্চিন্তে দিনের পর দিন আপন সাধনার পথে এগিয়ে চলেছে; কোন ভাবনাই মনে জাগে না। কিন্তু সত্যিই তো মার কথা—এমনি করে কি চিরদিন চলবে? ওর তৃতীয় উপন্যাসটা প্রকাশককে দিয়ে ও যা পেয়েছিল তাতে কিনেছে চাড্ডি বই আর একটা আলমারী। হ্যাঁ একটা শেফার্স্ কলমও বটে। কিন্তু টাকাগুলি ওই ভাবে খরচ না করে যদি ওর মায়ের হাতে ও সবগুলি তুলে দিতে পারতো তাহলে মা কত খুসীই না হতো। প্রথম বইটা ও প্রকাশককে এমনিই দিয়েছিল প্রকাশের আগ্রহে। দ্বিতীয়টায় যা কিছু ও পেলে তাতে বিশেষ আনন্দ পাওয়া যায় না—সেটা প্রকাশক-দের কৃপাদৃষ্টির বা সদ্বিবেচনার নিদর্শন। কিছু যা ও পেয়েছে তা এই তৃতীয় বইটাতে। কিন্তু এক বছরেই চারটে সংস্করণ বইটার হলো—আর টাকা দেবার বেলায় ওরা এত মোলায়েম করে কথা বলে কেন

—ও ভেবেই পায় না। থাক্‌গে গতস্য শোচনা নাস্তি। এ বইটা শেষ হয়ে এল বলে। এটা ও বেশী হারে ছাড়বে, আর বইটা নাম ও দাম দুই বাড়াবে নিশ্চয়ই—এই ও ভাবে। মাকে অন্ততঃ দুশো টাকা ও তা থেকে দেবেই ঠিক করে রাখে।

না খেয়েই ও উঠে পড়ে। ওর মা বলেন -কিরে, উঠে পড়লি যে! দুধটা খাবে কে' কাজের কথা বল্লাম আর ছেলের খাওয়া হলো না। তোকে নিয়ে আর পারা যায় না বাবা। গরীবের ঘরে কেন যে জন্মেছিলি ভেবে পাইনা। বড়লোকের ঘরে জন্ম নিলে সারা জগতের লোক একদিন তোর কাছে মাথা নোয়াতো। আমাদের কি আছে বল যা দিয়ে তোকে ঢেকে রাখি। সাধে কি আর তোকে ওই সব কথা বলি, না বলতে ইচ্ছে করে? গরীবের কিছুই সহ্য হয় না, চপল। তা নইলে তোকে বলি কাজের চেষ্টা দেখতে। লক্ষ্মী বাবা ওসব পরে ভাবিস্‌খ'ন। এখন পেটটা ভরে দুটো খেয়ে নে—দেখে স্বস্তি পাই। তোর মত ছেলেকে চাকরীতে পাঠিয়ে কি আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো বাবা? কোথায় কোনদিন কি বিপদ বাঁধিয়ে বসবি তার ঠিক নেই। ওকি, চলে যাচ্ছিন্‌ যে? দুধটাই না হয় শুধু খেয়ে যা।

—পেটে জায়গা থাকলে তো খাবো মা! এই দেখনা পেট—বলে গেঞ্জীটা তুলে ধরে। ওর মা বলেন—তাহোক, দুধটুকু খুব ধরবে, নাহয় একটু সন্দেশ দিচ্ছি—তাহলে তো হবে?

—বলছি জায়গা নেই তবু তুমি বলবে সন্দেশ দিচ্ছি—বলে ও এগিয়ে আসে। ওর মা মৃদু হেসে দুটো সন্দেশ ওর বাটীতে দিয়ে বাটীটা তুলে ধরেন ওর মুখের কাছে।

খাওয়া শেষ করে ও আঁচাতে চলে যায়। ও ভেবে পায়না ওর মা কি করে বুঝতে পারেন ওর মনের কথা। ঘরে ঢুকে ক্যাম্প চেয়ারটায় গা মেলে দিয়ে ও সিগারেট ধরায়। মা ওঘর থেকে চেঁচিয়ে বল্লেন—চপল এক্ষুণি কিন্তু কাগজ কলম নিয়ে বসিস্‌নে, শরীর খারাপ হবে। খাওয়ার পর খানিক জিরিয়ে তবে কাজ আরম্ভ করতে হয়।

—আচ্ছা তাই—বলে ও চোখ বোজে। হাতের অর্দ্ধ-দগ্ধ সিগারেট মাটিতে খসে পড়ে একটু পরেই···চোখে নেমে আসে নিদ্রা।

পঞ্চম পর্য্যায়

দুদিন পরের কথা বলছি। তখন প্রায় বিকাল হয়ে এসেছে, চপল টেবিলে বসে চিন্তায় নিমগ্ন। মুহূর্ত্তগুলির জীবনাবসান ওর চোখের পলক নড়াতে পারেনা।

চপলবাবু!

চপলের কল্পনাজাল তৎমুহূর্ত্তেই শত টুকরা হয়ে যায়। মনে বিরক্তির ছায়া ঘনিয়ে আসে—কপালের কুঞ্চিৎ রেখায় হয়তো তার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র ফোটে। চপল মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করে, কি প্রয়োজন বলুন।

না, প্রয়োজন এমন আর কি। এমনি এলাম দেখা করতে।

বেশ, বসুন।

আচ্ছা, আমি এলে আপনি বিরক্ত হন কি?

আমি? নাঃ, তবে আমার সাধনা হয়তো অধিকটা বিরক্ত হয় বইকি—মিস্ ডাট্।

ক্ষমা চাই তার জন্য, চপলবাবু।

ক্ষমা করতে গিয়ে সাধনার যে ক্ষতি জমে, তা পূরণ হয় না মিস্।

আপনি সাধক। কিন্তু বাস্তব জীবন বলে কি কিছুই নেই আপনার কাছে?

আমি কল্পনা দিয়ে, সাধনা দিয়ে, বাস্তবকে সত্যের নির্দ্দেশ দিতে

জন্মেছি—এই আমার ধারণা। আমার সাধনাই আমার চরম ও পরম বাস্তব সত্য, আর যা কিছু তা আমার কাছে গৌণ—এমন কি আহার নিদ্রাও।

জানি, শুনেছি তা মার কাছে। কিন্তু এই নিয়ে ক'দিন বেঁচে থাকবেন বলুন ?

—যতদিন পৃথিবী বেঁচে থাকবে এই আমার আশা। তেঁতুল পাতার ঝোল বুনো রামনাথকে অমরত্বই দিয়ে গেছে, অনাহার ও সন্তান-শোক দিয়ে গেছে, কার্লমার্কস্‌কে দেবত্ব, ভিক্ষুক চৈতন্য, বুদ্ধ, বিবেকানন্দ বহু যুগের কালপ্রবাহকে ব্যঙ্গ করে আজো বেঁচে আছেন মিস্‌ ডাট্‌। শ, টুরগেনির্ভ, হুগো, রবীন্দ্রনাথ অমর হলো —আর আমি মরবো শুধু বাস্তবের অজুহাতে? এত তুচ্ছ আমার জীবন—এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। কিন্তু এসব কথা আপনার কাছে বলতে কেনই বা যাচ্ছি? এ শুধু অন্তরের উচ্ছ্বাস ডলি, দেবী। আমার সাধনার পথে আর সব কিছু খসে যাক্‌, ঝরে ধূলায় মিশিয়ে যাক—দৃষ্টি আমার ঐ অচলায়তনের দিকে।

—আশে পাশে যারা থাকে একথা শুনলে তারা কষ্ট পায় চপলবাবু।

—কষ্ট পায়! তা পা'ক্‌। আর কেনই বা তাদের কষ্ট ?

—কষ্ট ?...কেন ?...তারা আপনাকে ভালবাসে বলে তাও কি বোঝাতে হবে ?

—আমাকে ?...না, না মিস্‌ ডাট্‌। আমার সাধনাকে যারা পিছু ডাক দেয় তারা আমাকে ভালবাসে না, তারা আমার মরণ চায়।

—ছিছি, ওকথা বলতে নেই। দীর্ঘায়ু লাভ করে আপনার প্রিয়-

জনদের আপনি আনন্দ দিন, সুখ দিন—এই আমার একান্ততম কামনা।

—সারা দুনিয়ার নিপীড়িত মানবজাতি আমার প্রিয়জন—তাদের সুখের পূজা আরম্ভ করেছি আমার জীবনধূপ জ্বালিয়ে। অন্য কিছু আমার কাছে নেই, আমার চোখে পড়ে না; আমার দৃষ্টির মাঝে আনতেও চাইনা আর কিছু।

—চপলবাবু!—ডলির কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ ভারী হয়ে আসে।—

—বলবেন আর কিছু?—চপল জিজ্ঞাসা করে।

—যে কথা বলতে চাই, তা বলতে পারি কই! আপনি ঔপন্যাসিক, কবি, শুনেছি আপনারা মানুষের মনের কথা অন্তর্যামীর মত বুঝতে পারেন।

—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, মিস্ ডাট্।

—এর চেয়ে বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু এই মাত্র জানি আপনাকে আমার কত ভাল লাগে। ধনী পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আমি। এত অর্থ নিয়ে আমি কি করবো ভেবে পাই না। ঐ অজস্র অর্থের ভার যদি আপনার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম, তাহলে নিজের জীবনকে সার্থক বলে মানতাম।

—আপনি···মানে···অজস্র অর্থ?···লোভ দেখাচ্ছেন? জানেন না বুদ্ধদেব রাজ্য ছেড়ে ছিন্নবস্ত্র স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন।

—আমাকে ভুল বুঝবেন না, চপলবাবু।

—আম্যাকেও ভুল বুঝবেন না, ডলি দেবী। আপনার অজস্র অর্থ আপনি রাস্তায় ছড়িয়ে দেবেন—হয়তো স্বার্থকতা মিলবে তাতে।

ডলি আহত হয়ে বলে চপলবাবু!···আমার দিকে তাকান··· তাকান আমার চোখের দিকে···আমি কি কুৎসিৎ ?

—এ প্রশ্ন কেন বলুন তো? —চপল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—বলুন না আমি কুৎসিৎ কিনা।

—আপনি সুন্দরীই মিস্ ডাট্—কিন্তু সে শুধু বাইরের সৌন্দর্য্য। ভাবের আদর্শের সৌন্দর্য্য যার নেই তাকে···নাঃ থাক্।

—জাষ্টিসের মেয়ে আমি—লেখাপড়াও করেছিলাম কিছু।

চপল মৃদু হেসে বলে—জানি আপনি গ্র্যাজুয়েট। মেয়েদের প্রয়োজনাতিরিক্ত লেখাপড়া করেছেন আপনি। অহঙ্কার আপনার মানায় যেখানে দেশের একশ'টা মেয়ের মধ্যে একজন মাত্র নাম সই করতে জানে। কিন্তু ভাবাদর্শের উচ্চতা যার নেই, তাকে আমি শিক্ষিত বলি না, বলতে মন চায় না, ডলিদেবী।

ডলির মুখে বিষাদ নেমে আসে। মনের কথা সোজা হয়ে মুখে বেরিয়ে আসে—আমি ··চপলবাবু···আপনাকে আমি ভালবাসি।

—আমি ভালবাসি আমার সাধনাকে, মিস্ ডাট্।

মুহূর্ত্তমধ্যে ডলির মুখ চোখ কঠিন ভাব ধারণ করে—শুধু ভাবের কুয়াশায় জীবনের ভুলের বোঝাই বাড়ে, চপলবাবু একথা ভুলে যাবেন না। জীবনের চলার পথে ভাবের সঙ্গে ভাবনাও জোটে—সে ভাবনা প্রয়োজন ও পাথেয়ের ভাবনা। রাতদিন কলম চালিয়ে প্রয়োজন মেটে না - একথা একদিন হয়তো উপলব্ধি করবেন।

—আমার এই জীবনের ওপর দিয়ে বহুতর প্রলোভন ও প্ররোচনা

চলে গেছে, দেবী। তাদের অবহেলায় জয় করেছি—সেই আমার গৌরব, সেই আমার পাথেয়।

ঘড়িতে চারটে বাজে। চপলের হঠাৎ মনে পড়ে যায় ওকে যেতে হবে মিলনীর সভায়। ও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মন থেকে মুছে যায় ডলির সান্নিধ্য আর কথার ছোঁয়াগুলি। মনের মধ্যে ভিড় করে আসে অজস্র প্রকারের কথা যাদের ও অভিভাষণরূপে অভিনব মালায় সাজাতে পারে। ডলি নির্ব্বাকভাবে বেরিয়ে গেলে চপল টেবিলে বসে ভেবে চলে—হ্যাঁ, মুষ্টিমেয় লোকের জন্য সাহিত্য নয়। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে পরিচয় করে যে সাহিত্য পা বাড়াতে শেখেনি—তার মরণ সুনিশ্চিত। দেশের মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবন-প্রণালী নিয়ে সাহিত্যের নামে বাড়াবাড়ি না করে, তাদের দিকেই নজর দেওয়া উচিত যারা সত্যিকার দেশের মানুষ। লক্ষ লক্ষ কলের কুলি একমুষ্টি অন্নের জন্য বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দেয়, কোটী কোটী কৃষক রৌদ্রজলে ভিজে, রোগ শোক অনাহারকে বরণ করে নিয়েও বিলাসের সামগ্রী, উদরের অন্ন জুগিয়ে চলে—তাদের কথা কেউ লিখে না। কেউ বোঝে না তাদেব ব্যথা, তাদের সমস্যার জন্য কেউ ধরে না কলম। কেউ শোনায় না তাদের সান্ত্বনার বাণী, কেউ মাতে না তাদের শিক্ষা দিতে, প্রেরণা দিতে। এখানেই দেশের সত্যকার আত্মহত্যা। দেশের শতকরা পঁচানব্বই জনকে বাদ দিয়ে মাত্র পাঁচ জনকে নিয়ে মাতামাতি করা এতে আছে মরণের বিষ। দরিদ্র চাষার কুটীরে অন্নের হাহাকার ওঠে, রোগের আর্ত্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে, অশিক্ষায় গ্রাম শুদ্ধ লোককে মরণের পথে ঠেলে দেয়—

তাদের কথা কেউ শোনে না, তা'দের কথা কেউ শোনায় না। দেশের সাহিত্য যদি তাদের দিকে ফিরে না চাইল, যদি না বুঝতে শিখলো, জানতে চাইল তাদের বেদনার ইতিহাস, তা'হলে সাহিত্যের কিইবা প্রয়োজন? চপল নিজেই আত্মহারা হয়ে পড়ে। ওর মনে পড়ে ও একবার কাগজে পড়েছিল—এক দরিদ্র কৃষক অন্ন-সংস্থানের কোন উপায় না দেখে নিজের ছেলে দুটোকে প্রথমে আছড়ে মারে, তারপর স্ত্রীর গলা কাটারী দিয়ে কেটে নিজে আড়ায় ফাঁসী লাগিয়ে সকল দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। সে কথা মনে হলে এখনো চোখ ফেটে জল আসে। শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর সন্তান যারা তাদের কি অবস্থা! এর জন্য দায়ী কে? যারা শিক্ষার আলো পেলো তারা মুখ ফিরিয়ে নিল ওদের দিক থেকে। গ্রামের দুরবস্থার মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে যারা পলে পলে মৃত্যু বরণ করে নিচ্ছে, তাদের কথা কেউ শুধাল না। চপল ভাবতে ভাবতে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

ষষ্ঠ পর্য্যায়

'মিলনীর' মিলন-বাসর। নেহাৎ তরুণ-তরুণীদের কাণ্ড। তাহোক চপলের তরুণদেরই ভাল লাগে—তবু প্রাণশক্তি আছে। প্রাণের রস যাদের শুকিয়ে গেছে, নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে যারা শুধু অতি সাবধানী সেজেই আছে, জীবনের ভাঁটার টানে বালুচরই শুধু যাদের চোখের সামনে রূপ ধরে তাদেরও বরদাস্ত করতে পারে না। তরুণ হয়েও যারা প্রবীনত্বের খেয়া ধরতে চায় ও তাদের দলে নয়—তাই ওর তরুণ মন সত্যকার তরুণ প্রাণকে খুঁজে ফেরে। মিলনীর পূর্ণিমা-সম্মেলনে এসে ও আনন্দই পায়।

চপল উঠে দাঁড়ায়—নিজের বক্তব্যের মধ্যেও প্রাণ ঢেলে দেবার চেষ্টা করে। প্রতি কথা বেরিয়ে আসে অন্তর থেকে। দেশের দুঃস্থ আত্মা যেন আজ আশ্রয় নিয়েছে ওর অন্তরের মধ্যে।—তাদের প্রাণের হাহাকার চপলের মুখ থেকে যেন মুর্ত্তি ধরে আত্মপ্রকাশ করে। ও ভুলেই যায় ও এসেছে মধ্য ও অভিজাত সম্প্রদায়ের আনন্দ-সম্মেলনে—যেটা খেয়ালেরই নামান্তর। ওরা কোনকালেই বুঝতে চায় না গরীবদের অবস্থা। চপলের অন্তর্নিহিত ভাবরাশি যেন বন্যার স্রোতের মত ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—তাকে চেপে রাখা দুস্কর।

বক্তব্য শেষ করে চপল যখন থামলো তখন সারা আসরটীতে বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। আবৃত্তি ও নৃত্যগীতের সুর মিলিয়ে গেছে—যেন

বসন্তের মলয়ের মাঝে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে বর্ষণশেষের স্তব্ধতা। চপল নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল উত্তেজনার বশে · তাই তাড়াতাড়ি চেয়ার আশ্রয় করে বসে পড়ে। সকলেই অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ও যেন সদ্যশান্ত আগ্নেয়গিরি—মুখে এখনো দীপ্তি দেখা যায়। ধীরে ধীরে সংকোচ এসে ওকে আশ্রয় করে এমনি ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ভেবে।

বৈঠক শেষে ও উঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে বাইরের দিকে পা বাড়ায়। মৃণালবাবু এসে ওকে নিয়ে চলেন লাইব্রেরী দেখাতে। কতকটা এগিয়ে গিয়ে বলে—আজ থাক্ মৃণালবাবু, আর একদিন এসে দেখে যাবো আপনাদের সব কিছু। এসব দেখতে আমার খুবই ভাল লাগে, তবে আজকে শরীরটা হঠাৎ কেন জানি না খারাপ লাগছে। আমি চলি, আর একদিন নিশ্চয়ই আসবো নিজেই।

মৃণালবাবু বলেন—সেকি! এরই মধ্যে যাবেন কি! একটু কিছু না খাইয়ে তো আপনাকে কিছুতেই ছাড়তে পারি না। লাইব্রেরী না হয় অন্যদিন দেখবেন; চলুন কিছু জলযোগ করে ধন্য করবেন। আর পরিশ্রম তো কম হয় নি। কি উদ্দীপনা পূর্ণ আপনার কথার স্রোত! হেসে বল্লেন - এখন বুঝতে পারছেন তো যে সোণা ফেলে আঁচলে হীরে বেঁধেই নিয়েছিলাম। সত্যই, যেদিকটা আপনি দেখালেন সেদিকে সাধারণ লেখকশ্রেণী নজর দিতে চায় না - তাতেই না দেশের এই অবনতি।

চপল আরো সংকুচিত হয়ে পড়ে। সোজাসুজি প্রশংসাবাদ শোনা, যা খোসামোদেরি নামান্তর মাত্র, ওর অভ্যাস নেই, ধাতেও সহ্য হয়

না। ও মনে করে—ওরা বুঝি এই ভাববিহ্বলতা দেখে ওকে বিদ্রূপ করছে।

—আজ আমায় ক্ষমা করুন মৃণালবাবু বলে চপল বাহিরের দিকে পা বাড়ায়।

—সেকি! তা হয় না চপলবাবু। আপনার বাড়ীতে দলশুদ্ধ গিয়ে সেদিন অত খেয়ে এলাম, আর আজ আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়েও এমনি কি ছেড়ে দিতে পারি, না তা উচিত?

—খাওয়া দাওয়া আনন্দমিলনের একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমার মোটেই ভাল লাগছে না। অনুরোধ রাখতে গেলে মনের ওপর জুলুম করা হবে মৃণালবাবু।

—তা হয় না চপলবাবু - মীরা হাসিমুখে এগিয়ে আসে। আমাদের অত্যাচার না হয় একটাদিন সহ্যই করলেন, তবু আমরা তো তৃপ্ত হবো। হাতের কাগজটা দুবার পাক দিয়ে চপল বলে—আচ্ছা···চলুন। এখানকার আবহাওয়া যেন ওর ভাল লাগে না, তাই বাইরে এসে হাঁফ ছাড়তে চায়। কিছু মুখে দিয়েই ও উঠে পড়ে।

মীরা পাশে দাঁড়িয়ে বলে—বাঃ খেলেন কই!

চপল ঈষৎ হেসে বলে – ক্ষমা করবেন···হ্যাঁ আপনি···মানে আর ধরছে না পেটে—বলে ও বেরিয়ে আসে।

মৃণালবাবু মোটর নিয়ে হাজির করেন। চপল রাস্তার দিকে পা বাড়ায়।

—বাঃ, মোটরে আসুন।

চপল সরল ও স্বচ্ছ উত্তর দেয়—না, আমার হাঁটতেই ভাল লাগছে

—বলে এগিয়ে চলে। এরা অবাক্ হয়ে এই অদ্ভুত মানুষটার দিকে চেয়ে থাকে।

খানিকটা রাস্তা ও হেটে চলবে। বাইরের খোলা হাওয়ার মধ্যে এসে যেন চপল প্রাণ ফিরে পায়। বাঃ, হাঁটতে ওর বেশ লাগছে তো! এমনিভাবে চপল হেঁটেই চলবে যতদূর পারে—তারপর না হয় একটা বাস ধরা যাবে—ও ভাবে। মৃণালবাবু মোটরে পৌছে দিতে চেয়েছিলেন, রাজী না হয়ে ও ভালই করেছে। কি হবে ওদের করুণার বোঝা বাড়িয়ে? পৌছে দিয়ে হয়তো পেট্রল মেপে দেখবে।

পূর্ণিমার রাত। রাতে শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা ভাসিয়ে দিয়েছে বাড়ীর ছাদগুলো। মাঝে মাঝে ছোট ছোট লন—ওরা যেন আনন্দস্নান করছে ধারাস্রোতে। ঐ দূরে স্বরু হয়েছে লোক আর আলোকের ভিড়। জ্যোৎস্না ওখানে মরে গেছে। নৈসর্গিক সুখকে মানুষ ওখানে হত্যা করেছে। বড় ভাল লাগছে এই চাঁদের আলো। ও আরো ধীরে পা চালায়।

—নমস্কার চপলবাবু—সামনে থেকে একটী মেয়ে অভিবাদন জানায় চোখ তুলে চপল তাকে চিনতে পারে না, বলে—···হ্যাঁ, নমস্কার··· আপনি···মানে আপনাকে।···

—চিনতে পারছেন না? আমার অদৃষ্ট! কতবার আপনার বাড়ী গেছি। আমার নাম মিসেস্ অঞ্জলি সোম। আপনার বাড়ী গিয়ে

আপনাকে গান শুনিয়েছিলাম—মনে পড়ে না? ভারী ভাল লাগে আপনার ঘরটা।

চপল মাথা নেড়ে বলে—ও, শুনিয়েছিলেন বুঝি? বেশ বেশ—বেশ গান আপনি।

—যদি বলেন আবার গিয়ে শুনিয়ে আসবো যত শুনতে চান।

—আচ্ছা, কয়েকদিন পরে, কেমন? বড় জরুরী একটা লেখা হাতে রয়েছে কিনা। কাজ হাতে করে গান শুনে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। ঠিক কিনা বলুন।—এই বলে ও এড়াতে চায়।

শ্লথ চরণ আবার এগিয়ে চলে। পাশের পার্কটায় খানিক বসে পড়বে কিনা ও ভাবে। থাক্‌গে রাত হয়ে যাবে, মা হয়তো বসে থাকবেন। চপল এগিয়ে চলে।

—নমস্কার—

চপল পিছন ফিরে চায়। দেখে এক অপরিচিতা মেয়ে, তাই আবার পা চালায়। —ভাবে হয়তো বা অন্য কাউকেই জানিয়েছে নমস্কার। ফিরে তাকানোই ওর অন্যায় হয়ে গেছে।

—চপলবাবু!—

তাইতো, ওকেই যে ডাকে, ও পিছন ফিরে দেখে সেই মেয়েটীই, তাই আবার পা চালায়। পিছনের মেয়েটী ত্বরিৎ পদক্ষেপে চপলের সামনে এসে হাতযোড় করে দাঁড়িয়ে আবার বলে—নমস্কার।

চপল থম্‌কে দাঁড়িয়ে বলে—ও, আমাকেই বলছেন কি?

মেয়েটী হেসে বলে—কবি চপল বসু আপনারি নাম তো?

চপল সহজ ভাবে উত্তর দেয়—না তো?

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে মেয়েটী বলে—কি না তো ?

– কবি নয়।

—উঃ, খুব বাঁচিয়েছেন। বাদ বাকীটা তাহলে সত্যি। এখন বুঝতে পারছেন কি যে আপনাকেই নমস্কার জানিয়েছি ?

– "ও, আজ্ঞে·· তা...নমস্কার। কিছু প্রয়োজন ছিল কি ?

—আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ধন্য হতে চাই চপলবাবু। আমি আপনার ভাবধারা ও রচনার একজন বিশেষ অনুরক্তা। গ্রহণ করতে চেষ্টা করি সে সব ভাবসম্পদকে নিজের মধ্যে। আপনার রচনা নতুন বাণী শুনিয়েছে দেশকে।

—আমার ?

—তাইতো। মানে সাহিত্যিক চপল বসুর লেখনী। আপনিই কবি—না না, শুধু চপল বসু—সেকথা তো একটু আগেই স্বীকার করেছেন। মাসিক, সাপ্তাহিকের ভেতর, বইএর পৃষ্ঠায় পড়ি আপনার লেখা, দেখি আপনার নাম। মানুষটীকে দেখিনি চিনিনি এর আগে। আজ প্রত্যক্ষ করলাম আপনাকে, শুনলাম প্রাণ-ঢালা বাণী। সবিশেষ প্রতিভা ও আন্তরিকতা না থাকলে এমন ভাল জিনিষ কেউ দেশকে দান করতে পারে না।

—তা আমি···

– হ্যাঁ, আপনিই। উদীয়মান গণ-সাহিত্যিক শ্রীচপল বসু মহাশয় মান্যবর—যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমি এখন মানে এই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছি অর্থাৎ আলাপ করছি, তাঁর সাথে অর্থাৎ চপল বসু মহাশয়ের সাথে দ্যাট্ ইজ্ আপনার সঙ্গে আমার মিস্ মীরা সেনের

একটু প্রয়োজন আছে ; তাই আপনাকে কষ্ট দিয়েও আলাপ করবার এতখানি স্পৃহা। জানেন তো—মেয়েরা স্বার্থপর ?

—ও, হয় বুঝি ?

—আপনি তার পরিচয় পাননি, এই তো ? তার মানে আপনি থাকেন নিজের ভাবরাশির মধ্যে ডুবে, ওসব দিকে তাকাবার অবসর আপনার নেই। কিন্তু সাহিত্যিক আপনি, স্পর্দ্ধা ক্ষমা করবেন, মেয়েদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখলে আপনার সৃষ্টি যে অসম্পূর্ণ হবে, চপলবাবু। মেয়েদের সমস্যা, তাদের ভাব, মন ও কামনাকে বাদ দিয়ে যা সৃষ্টি করবেন তা হবে নিছক কল্পনা, নিরর্থক অর্থাৎ আধখানা জগতের ওপর হবে অবিচার। জানেন তো জগতে মেয়ের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে কম নয়, এবং জগতের বুকে তাদের স্বার্থ পুরুষেদের চেয়ে বরং বেশীই ?

—তাই নাকি ?—চপল বিস্মিত চোখে মীরার দিকে তাকায়। ও বলে—আপনি ভুল বুঝেছেন……কি বল্লেন আপনার নাম·· মিস্ মিস্··· দূর ছাই···হ্যাঁ, মীরা সোম···ও, সোম নয়, সেন বুঝি ? আমি চোখ মেলে রাখি মানুষের দিকে—যেখানে স্ত্রী বা পুরুষ বলে বিশেষ কিছু নেই। আর হ্যাঁ·· মেয়েরা স্বার্থপর একথা কোন মেয়ের মুখ থেকেই শুনতে ভাল লাগে না, মানে মানায় না যেন।

মীরা মৃদু হেসে বলে—কিন্তু সত্যই তো সত্যকার ভূষণ হওয়া উচিত, চপলবাবু এবং তাতেই মানাতে শেখা ভাল নয় কি ? সত্যকে সহ্য করতে আমরা ভুলে গেছি বলেই না আমাদের সমস্যা দিন দিন বাড়ছে ?

—মানলাম আপনার কথা। কিন্তু ডিসেন্সী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য বলে একটা জিনিষ তো আছে? ফুল থেকে চোখঠাণ্ডা করা গোলাপজল বা মাথা ঠাণ্ডা করা হেয়ার অয়েল হওয়াটাই একমাত্র সত্য, আর তার রূপ, গন্ধ কি কিছুই নয়?

—শুধু রূপ আর গন্ধ দিয়ে কি সমস্যা ঘোচে, চপলবাবু?

—ঘোচে না যদিও তবু সরল হয়, মিস্…মিস্। রূপ আর গন্ধটাই ফুলের আদি ও অকৃত্রিম, নির্য্যাসটা কৃত্রিম আর জটীল যদিও তা ফুলের মধ্যেই ছিল, বুঝলেন কি আমার বক্তব্যটা?

—বুঝবার চেষ্টা করছি বলতে পারি। কিন্তু স্বল্প পরিচয়েই আমি বড় বেশী বকছি, না?

চপল সোজা উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

—তার মানে?

—তার মানে এই যে—উপস্থিত এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব শুদ্ধ যতগুলি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে, তার আধখানি আপনার রসনা-নিসৃত এবং বাকী অর্দ্ধেক আপনারি প্ররোচনা-প্রদীপ্ত।

—বাঃ, আপনি তো বেশ মানুষ! দিব্যি সত্যি কথা বলার সংসাহসটাও দেখিয়ে দিলেন অমনি? অপ্রিয় সত্য বলতে নেই, তাকি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে?

—ও, কিন্তু আপনি আপনার নিজের সত্য-তৃষাকেই খর্ব্ব করলেন তাকি বুঝতে পারলেন? ভয় পাবার কিছুই নেই; শিক্ষিত ও আলোচনা-প্রবন মনকে আমার ভালই লাগে—বলে চপল চুপ করে।

মীরা মুগ্ধনেত্রে চপলের দীপ্তিভরা চোখদুটীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ওর নিজের আঁখি-পল্লব ভারী হয়ে আসতে চায়। চপলের মুখে যেন ওর স্বপ্নখণ্ড ভেসে ওঠে—ও তাই আনত চোখদুটী ফিরিয়ে নিতে পারে না।

চপল হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে। মীরা ত লক্ষ্য করে বলে—আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে নয়? চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—ব'লে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ে। ভেতরে বসে ডাকে—আসুন।

চপল নিস্পৃহভাবে উত্তর দেয়—কি হবে ট্যাক্সিতে? আমি বাসেই যাই।

মীরা নেমে এসে বলে—সময়ের যে ক্ষতিটুকু করিয়ে দিলাম তা পূরণ করবার অবসর চাই চপলবাবু। তাতে আমার লাভের অঙ্কই বাড়বে—আপনার সান্নিধ্যে। আসুন, দোহাই আপনার।

চপল ভাবে—তাইতো, মুস্কিলে ফেল্লে দেখছি, কি করা যায়? শেষে ট্যাক্সিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতেই হয়।

মীরা সোফারকে বলে দেয়—এই, মানিকতলা চলো।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটে। চপলের মনে নেমে এসেছে অন্য সমস্যার কথা—তাই ও নির্ব্বাক হয়ে ভেবে চলে।

মীরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, বলে—কই, একেবারে চুপ করলেন যে? কথা বলুন।

চপল সচকিত হয়ে উঠে বলে—কি বলবো বলুন তো?

—আমাকেই বুঝি তা শিখিয়ে দিতে হবে?……বাঃ, কই বলুন।

—আমি ? আপনিই যে কি প্রয়োজনের কথা বলবেন বল্লেন।

—হ্যাঁ, সে কথা বলছি পরে।

—কিন্তু আমার তো কিছু বলবার নেই।

—তা জানি। এমনি কথাবার্ত্তাই বলুন না হয়। নির্ব্বাক বসে থাকতে কি ভাল লাগে ?

চপল নড়ে বসে বলে—হ্যাঁ, এই যে বলছি। এই যেন কি বলবো বলবো মনে করছিলাম···আপনার নাম বুঝি শ্রীমতী মীরা সেন ?

—না, মীরা হেসে উঠে বলে—আমার নাম কুমারী মীরা সেন।

—তার মানে আপনি এখনো স্বাধীন, এই তো ?

—পুরোপুরি নয়, মা দাদা আছেন।

—তা···আপনি বুঝি বেথুনে···না না ইউনিভার্সিটীতে পড়েন ?

হলো না···

তবে ?

ছেড়ে দিয়েছি গত বৎসর থেকে ও সব হাঙ্গামা। এখন একটু পড়বার চেষ্টা করছি আপনাদের নিয়ে, অর্থাৎ সাহিত্য-চর্চ্চার পাগ্‌লামী ঢুকেছে। তাতে অবসর মুহূর্ত্তগুলি বেশ কাটে, তার সঙ্গে মনের ভাবও বলতে হবে বৈকি।

······এই রোকো খোড়া। ট্যাক্সি এসে ফুটপাতের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে। চপল তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে যায়। মীরা টেনে বসিয়ে দিয়ে বলে –ওকি, উঠছেন যে। এতো মৌলালীর মোড়। বসুন একটু, আমি ছুটে একটা জিনিষ নিয়ে আসি এদের দোকান থেকে।

চপল আবার নিছক বসে থাকে। ও যেন এক নতুন জগতে

এসে পড়েছে! কোন তরুণীর সাথে একই গাড়ীতে একই আসনে ওর এই প্রথম চলা। জীবনে ট্যাক্সিতেই উঠেছে কম—গুণে বলতে পারে ক'বার। দোতলা বাসের মাথায় উঠে সামনের বেঞ্চে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকা ওর কাছে একটা বিলাস। আসনের পাশে কোন দিন কোন অপরিচিতা তরুণী হয়তো উঠে থাকবে, কিন্তু সেদিকে ও একেবারে অন্ধ। সারা দেশের সঙ্কোচ এসে যেন ওকে ছেয়ে ধরে। সোজা চোখ রেখে চুপ করে বসে থাকে আড়ষ্ট হয়ে, কিংবা টিকেটের মেয়াদ ফুরোতে না ফুরোতেই গন্তব্যের অনেকখানি আগেই নেমে পড়ে। দোকানে কাপড় কিনতে গিয়ে মেয়ে খরিদ্দার দেখলে ও চুপি চুপি পালিয়ে বাঁচে; পাছে কেউ দেখে ফেলে—এই ওর স্বভাব।

মীরার পাশে বসে ও নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখে ওর এই ভাল লাগছে কিনা। চপল নিজের প্রশ্নের ভেতর ডুবে যায়, অন্য সব কিছু ভুলে।

মীরা ফিরে আসে অল্পক্ষণ বাদেই। নাঃ, ওর চোখটা আজ অবাধ্য হয়ে উঠেছে দেখছি। কিছুতেই ও তাকাবে না মীরার দিকে, তাই ভেবে ঘাড় নীচু করে বসে থাকে।

মীরা চপলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—কি ভাবছেন?

কিছু না তো।

আপনার দামী সময়ের বড় অসদ্ব্যয় করিয়ে দিচ্ছি, না?

চপল মুখ তুলে বলে—আমি তা বলেছি?

সব জিনিষ বুঝতে কি আর মুখের কথার অপেক্ষা থাকে?

আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি তো বেশ আছি।

দেখে তো মনে হচ্ছে না, চপলবাবু। বরং এই মনে হচ্ছে যে, আপনি ঠিক স্বাভাবিক নেই ; কিসের যেন দ্বন্দ্ব আপনার ভেতর—যার ছায়া পড়েছে মুখে।

তা কেন ? আপনার সাথে আলাপ করে বরং খুসীই হয়েছি। চপল লৌকিকতা বজায় করতে চেষ্টা করে।

সত্যি ? ধন্য হলাম। কিন্তু খুব কষ্ট দিলাম আপনাকে, না ?

মৃদু হেসে চপল বলে—কি যে বলেন ! আমার তো মনেই হয়নি কোন কষ্টের কথা।

মীরা চোখ বুজিয়ে বলে—আঃ বাঁচলাম।

আঁচলটাকে গুটিয়ে নিয়ে মীরা চপলের সামনে দিয়ে এসে ওর পাশে বসে পড়ে—মধ্যে একটুখানি ফাঁক রেখে। সংকোচ তো আছে ; ভদ্রতাকেও তো বাদ দেওয়া যায় না।

মীরার সাড়ী থেকে ছড়িয়ে পড়ে দোকান থেকে সদ্য-কেনা দামী সেন্টের মিষ্টি গন্ধ—যেন নেশা লাগে। ওর হঠাৎ সখ চেপেছে।

মীরাই কথা বলে—চপলবাবু, বাঃ এদিকে তাকান। দেখুন তো এটা কেমন—ব'লে একটা ঝরণা কলম বাক্স খুলে চপলের হাতের ওপর রেখে দেয়।—

– কলম ? কিনলেন বুঝি ? আপনার পছন্দ আছে।

—আমি নিজে পেলিক্যান পছন্দ করি—তাই নিজের পছন্দকে আপনার দ্বারা যাচাই করে নিলাম।

—কদর বাড়িয়ে নিলেন নিশ্চয়ই ?

— সত্যিই ওর কদর আছে, চপলবাবু—যেহেতু ওটা আপনার হাতের স্পর্শ পাবে নিত্যই।

—তার মানে ?—চপল বিস্ময় প্রকাশ করে।

—মানে বলছি, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারবেন না বলে রাখলুম, কারণ তাহলে ওর সংগ্রাহিকার কদর নষ্ট হবে।

—ব্যাপারটা তো জটীলতরই করে তুলেছেন দেখছি।

ভয় নেই, সরল করে দিচ্ছি—বলে কলমটা চপলের বুক পকেটে গুঁজে দেয়।

চপল প্রতিবাদসূচক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চাইতেই মীরা হাত জোড় করে মিনতি জানায়।

গাড়ী এসে মানিকতলার মোড়ে দাঁড়াল। চপল তাড়াতাড়ি নেমে আসে গাড়ী থেকে ; নমস্কার করেই সোজা চলতে সুরু করে। ওর যেন কি ভুল হয়ে যাচ্ছে সর্ব্বদাই—চপল তা ভেবেই পায় না। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—সময় পেলে আর ইচ্ছা হলে আসবেন মাঝে মাঝে, আলাপ করে সুখী হবো।

—তবু ভাল—মীরা বলে। এরই মধ্যে পরিচয়ের সূত্র ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলেন দেখি।

—বাঃ, আমি যে ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার দেওয়া কলমের চিন্তাতেই উদ্ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

—কেন দ্বিধা করছেন, চপলবাবু? শপথ করে বলছি, ওতে তিল মাত্রও বাহাদুরীর স্পৃহা নেই। আপনি লেখক, তাই লিখবার কলমকে এই পরিচয়-সৌভাগ্যের সাক্ষী করে রাখলাম। ওকে গ্রহণ

করে আপনি আমায় কৃতার্থ করেছেন—এ আমার অন্তরের সত্য। মিথ্যা বলে তাকে ভুল করলে মানুষের আন্তরিকতার মর্য্যাদা থাকে না, চপলবাবু।

—ভুল করাই যে মানুষের স্বভাব মিস্ সেন।

—তা বটে, বিশেষ ক'রে আপনার মত গুণী মানুষের। সে যাক্, আমার ঠিকানাটা লিখেই দিচ্ছি—দেখবেন যেন আবার ভুল করে ওটা রাস্তায় ফেলে যাবেন না। আপনার বাড়ীর নম্বর তো আটাশ্? মৃণালবাবুর কাছে ওটা জানতে পেরেছিলাম, আর এখনো তা' ভুলিনি দেখছি। ফোন্ নাম্বারটাও রেখে গেলাম ওই সঙ্গে। ছুটীর দিনে দুপুরের দিকে বাড়ীতেই থাকি। আর নিজেই যদি এসে হানা দিই কখনো কখনো চটে যাবেন না তো?

চপলের চোখের সামনে তার মায়ের মূর্ত্তি ভেসে ওঠে। এই মাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে ও কোন কাজই করতে পারে না। মাকে যতদূর জানে তাতে ও নিশ্চিন্তই বটে। দুনিয়ায় একমাত্র মাকেই ও চেনে, তাই কোন কথাই মা'র কাছে গোপন রাখে না। ও ভাবে মা কি সায় দেবেন মীরার আগমনে?

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যায়। মীরা একদৃষ্টে চপলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। চপল ভেবে চলে। শেষে মীরা আবার প্রশ্ন করে —কই, বল্লেন না, চটে যাবেন কিনা?

চপল বলে—মানুষের বাড়ী মানুষ এলে কি কেউ কোন কালে চটে?

—সে জানি না। আপনি বিরক্ত হবেন কিনা তাই বলুন।

—তা হবো কেন ! বরং খুসীই হবো মীরা দেবী।

—তাহলে অভয় দিলেন তো ?

—নিশ্চয়ই। আচ্ছা নমস্কার—বলে চপল পা বাড়ায়। হঠাৎ আবার ফিরে বলে (ওর সামাজিক বুদ্ধির উদয় হলো যেন)—আপনার খুব কষ্ট হলো নিশ্চয়ই। কিছু মনে করবেন না।

মীরা বলে—কষ্ট তো বরং আমিই দিলাম—আপনাকে। ওকথাটা তো আমারই বলা উচিত ছিল।

—তা কেন। বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত আপনাকে টেনে নিয়ে এলাম। ফিরতে আপনার কত রাত হয়ে যাবে বলুন তো। বাড়ীতে হয়তো আপনার মা আপনাকে কত বকবেন (নিজের মা'র সাথে মিলিয়ে বলে)

—একটু বকুনি না হয় খেলামই ; কিন্তু আজ যা লাভ করলাম তার সন্ধান তো তিনি রাখবেন না।

—লাভ !

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনার সাথে ঘনিষ্ঠতা সে কি কম লাভ ?

চপল মৃদু হেসে বলে—আচ্ছা, আমিও তো সেকথা বলতে পারি।

— তা কি করে পারেন বলুন। আপনার দর্শনটাই কাম্য সকলের কাছে, আমার কাছেও। আমার জন্যে কে আর ভিড় জমায় বলুন ?

—জমায় না ? কতজন হয়তো চায় আপনার দর্শন।

—কিন্তু আপনি চান কি ?

—আমার কথা ছেড়েই দিন। হয়তো চাই কিংবা হয়তো চাই না।

—বাঃ, আপনার কথার যে কোন মানেই হয় না কবি মশাই।

—তা হবে। মীরা দেবী, সত্যিই রাত হলো, বাড়ী ফিরুন—বলে চপল এগিয়ে চলে।

মীরা চপলের গমন-পথের দিকে চেয়ে থাকে। ও কি ভাবে ওই জানে।

সপ্তম পর্য্যায়

বাড়ী ফিরে চপল ওর নিজের ঘরটীতে প্রবেশ করে। ইতস্ততঃ ছড়ান জিনিষ-পত্রগুলি। বিছানা হয়ে আছে এলোমেলো, মশারীর কোণের দাঁড়টা গেছে ছিঁড়ে—বিছানার ওপর সেটা লোটাচ্ছে। দেয়ালে টাঙানো আয়নাটায় ধরেছে ময়লা—যেন রূপসী নটীর গালে পড়েছে কুঞ্চন। জামা-কাপড়গুলো কোনটা বিছানার ওপর, কোনটা চেয়ারের গায়, আর কোনটা বা স্যুটকেশটার পিছন দিকেই মুখ ভার করে পড়ে আছে। বই খাতাপত্রগুলো টেবিলের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত মেলা বসিয়েছে যেন। টিপয়টাতে শূন্য পেয়ালা শূন্য মনে চেয়ে আছে—বলবো কি 'কাঙালিনী মেয়ে'র মত ?···নাঃ, ও নিজে ভারী অলস মানুষ দেখছি। আহা, জলের গ্লাসটা টেবিলের নীচে গড়াগড়ি যাচ্ছে যে। ছি ছি, কবিতার খাতাটা ওখানে নিয়ে গেল কে ? তাই তো! 'সুচিত্রার' অনুরোধে যে গল্পটা ও লিখে রাখলো, সেটা কি গোব্‌রা বেটা নৌকা বানাতে নিয়ে গেল নাকি! যা লেখে ও একবারই লেখে ভাবের জোয়ারের মুখে—ফেয়ার কপি করবার ধৈর্য্য ওর নেই। সর্ব্বনাশ, তাহলে ? নাঃ, যাক্‌গে সব চুলোয়। ও আর নিজে কাঁহাতক সামলাবে—জামা রে, কাপড় রে, বই রে, কলম রে, খাতা রে, কাগজ রে, এমন কি মশারী বিছানা পর্য্যন্ত। এখানে কি মানুষ থাকতে

পারে? এ যেন ঘোড়ার আস্তাবল—চতুর্দ্দিকে ছড়ানো বন্য স্বভাবের চিহ্ন। চপল চীৎকার করে উঠে—মা, ও মা···

কোন উত্তরই আসে না। ও ফের ডাকে, আবার, আবার।

মা আসেন ব্যস্তসমস্তভাবে মৃদু হাসির রেখা মুখে নিয়ে; বলেন—কিরে, চেঁচাচ্ছিস্ কেন? হলো কি শুনি?

চপল ততক্ষণ ঐ বিছানাটাতেই লম্বা হয়েছে জামা জুতো শুদ্ধ।

ওর মা বলেন—তাহলে চল্লুম, তুই শুয়েই থাক।

চপল ধড়মড় করে উঠে—মার সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলে—তার মানে? তোমাকে কি শুধু এসেই চলে যাবার জন্যে ডেকেছি নাকি ইন্‌স্‌পেকট্রেস্ সাহেব?

মা হেসে বলেন—আপনার অভিযোগ বলুন তাহলে।

চপল হতাশভাবে বলে—নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর চল্‌লো না; কি সব ছাই-পাঁশ রান্না-বান্না কর রাতদিন। তার চেয়ে একটু কাজের মানুষ হও দেখি, মার কথাগুলিই ঘুরিয়ে ব'লে ও নিজের তারিফ নিজেই করে।

মা কপট গাম্ভীর্য্য অবলম্বন ক'রে বলেন—খুব পণ্ডিত হয়েছিস্ দেখছি। ডাকছিলি কেন এখন তাই বল।

চপল মার কাছ থেকে সরে এসে বলে—কেন আবার। আমার ঘরটা কি দেখতে নেই কোনকালে? এখানে কি মানুষ থাকে বলে মনে হয় তোমার? এ কাপড়টা তো ছাড়তে হবে। স্লিপারটাই বা গেল কোথায়? আচ্ছা, কোন মানুষ এই ধরো না মীরা দেবীই যদি আসতেন আমার ঘরে তাহলে কি মনে করতেন বল তো? ভাবতো নাকি যে একটা একটা গিনিপিগ্ পুষে রেখেছ খাঁচার মধ্যে অথচ খাঁচা

পরিষ্কার করা হয়নি একসপ্তাহ ধরে? নাঃ, তোমরা ভারী ইয়ে।··· ঝিটাকেও তো একবার পাঠিয়ে দিতে পারতে! এই দেখ খাতাটা কোথায় পড়ে রয়েছে। না বল্লে যেন কিছু করতে নেই।—মার কাঁধে হাতদুটো রেখে বলে—আচ্ছা, আমি যদি বোবাই হতাম, তাহলে কি হতো? আঁস্তাকুড়ে ফেলে রাখতে তো?

মা হাসেন, বলেন—হতভাগা ছেলে এরই জন্যে এত চেঁচামেচি? আমি তো মনে করলুম বুঝি বা ডাকাত পড়েছে বাড়ীতে তাই দিগ্বিজয়ী চপলকুমার হাঁক ছাড়ছেন। হ্যাঁরে, সকালবেলা আমি নিজে তোর ঘর গুছিয়ে দিয়ে গেলাম না? এরই মধ্যে গুণধর এমনি করে তুলেছ, তা কি করে জানবো বাপু? জিনিষপত্র গুছিয়ে সাবধানে ব্যবহার করতে তো কোনকালেই শিখবে না!

চপলকুমারের রাগ বেড়ে ওঠে, বলে—হুঁঃ, ছাই গুছিয়েছ। আজ সকালে কখন আবার এলে তুমি আমার ঘরে? সেই কোন যুগে একবার গুছিয়ে দিয়েছিলে তার ঠিক নেই!

বলিস্ কিরে!—মা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন—কি ভুলোরে তুই! তাই তো বলি বউ নিয়ে আয়, তাহলে সর্ব্বদাই সব গোছানো ঝর্‌ঝরে থাকবে দেখিস্। তা নয়, বিয়ের নাম শুনলে ছেলে যেন ভিরমী খান। বই আর কাগজ কলম নিয়েই মুখে গুঁজে আছেন রাতদিন। ওসব ছাই পাঁশ দিয়ে কি হবে শুনি?

চপল বিস্ফারিত নেত্রে বলে—কি সব ছাই পাঁশ? বই আর কাগজ কলম? আর তোমার বউ আর বিয়ের কথাই বুঝি হীরেমুক্তো? বিয়ে করলে কি খাওয়াব শুনি?

—কেন দুনিয়ার লোক যা খাওয়াচ্ছে। পুরুষ মানুষ না তুই ?

পুরুষ মানুষ বলেই কি বলদের কাজ করতে হবে নাকি ? আচ্ছা বলতে পারো পাশে শুয়ে ফোঁস ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে একটা অকর্ম্মণ্য জীবকে বসে বসে খাওয়ানোর কি প্রয়োজন ? বউই হোক্ আর যেই হোক্, তোমার মত সর্ব্বংসহা হতে পারবে সে ? বলে চপল মার গলা জড়িয়ে ধরে।

মা ওর চুলের ভিতর হাত দিয়ে বলেন—কিন্তু বাপু একলাটী খেটে খেটে জীবনটা আমার যাবার দাখিল হলো যে। বুড়ো হচ্ছি না আমি ?

চপল চঞ্চল হয়ে উঠে বলে—বা রে, ঝিটা কি করে তাহলে ? খালি বুঝি কাজে ফাঁকী দেয় ? দাঁড়াও, কাল সকালেই আচ্ছা করে ধমকে দিচ্ছি ওকে। সত্যি, তোমার শরীরটা তো খারাপই হচ্ছে দিন দিন। আচ্ছা মা, ঝিটা কখন আসে বলো তো ? তখন আমাকে একটীবার ডেকে দিও, ব্যস্।

- নে নে খুব বীরপুরুষ বুঝতে পারছি। এখন জামা জুতো ছাড়বি, না ওই শুদ্ধই রাত কাটাবি ? পায়জামাটা ওই খাটের নীচে পড়ে রয়েছে, স্লিপারটা টেবিলের নীচে। চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখলে তো পারিস্।

চপল তাড়াতাড়ি জামা কাপড়টা ছেড়ে নেয়। তারপর টেবিলে এসে চেয়ার টেনে বসে পড়ে। মা ততক্ষণে জামা-কাপড়গুলো গুছিয়ে, বিছানাটা ঠিক করে দিয়ে চলে যান। যাবার সময় বলে যান খেয়ে নবি আয়, চপু, বেশী রাত্তির পর্য্যন্ত ব'সে থাকতে পারি না।

চপল খেয়ে এসে আবার টেবিল আশ্রয় করে বসে। ওর ভারী লিখতে ইচ্ছা করে আজ। কিন্তু কি লিখবে ও?

কলম চলে আর মুহূর্ত্তগুলি অলক্ষ্যে উঁকি দিয়ে অনন্তের কাছে সাক্ষী দিতে চলে। লাইনের পর লাইন শেষ করে চপলের দৃষ্টি প্রারম্ভে ফিরে আসে। একি লিখেছে ও! এধারার কবিতা এর আগে কখনো তো ওর কলম থেকে বেরোয়নি। ও লিখেছে দেশের ঐতিহাসিক গৌরবের কথা, নিপীড়িত বুভুক্ষিত জনগণের কথা, বর্ত্তমান সমস্যার কথা, আর না হয় বড় জোর অপরূপ মাধুর্য্যময়ী প্রকৃতি দেবীর বর্ণনা। কমল-বিলাসীদলের কবিও নয় যারা একটী বক্তব্যকেই নানারূপে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাহিত্য রচনা করতে চায়। চপল মনে করে এইসব কবিরা দেশের প্রাণশক্তিকে নিভিয়ে দেবারই চেষ্টা করে, ওরা ক্ষমার অযোগ্য। এদের গল্প উপন্যাস লেখা নয়তো খালি ন্যাকামি। ও ভাবে আমাদের দেশে কি একজনও গোর্কী, লার্মন্টভ্, হুগো বা হুইটম্যান্ জন্মাবে না? আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা না জানে ভোগের কথা বলতে প্রাণঢেলে, না জানে ত্যাগের প্রেরণা দিতে—খালি নাকে কান্না। আরে ছোঃ এর নাম সাহিত্য? রবি ঠাকুর জন্মাল; কিন্তু বেচারা কত দিকেই বা সামলাবে? গান লিখবে না গাইবে, কবিতার ছন্দ মিলাবে না আবৃত্তি করবে, নাট্যকার হ'বে না নিজেই হবে নট! দর্শন থেকে সুরু করে যায় ছেলে-ভুলানো ছড়া পর্য্যন্ত ওই একটা লোকই তাল রাখলে। শরৎবাবু যাও বা নামলেন দেশের সমাজ সমস্যা নিয়ে কিন্তু শুধু সমস্যা দেখিয়ে বা প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত; উত্তর কোনটারই দেবার সাহস পেলেন না জোর গলায়।

আর হ্যাঁ, এক 'দেবদাস' লিখেই তিনি দেশের মাথাটা চিবিয়ে খেলেন, বই পড়ে আর না হয় পর্দ্দার গায়ে অশ্লীলতার অভিনয় দেখে কতকগুলি তাজা যুবক একেবারে উৎসন্নে গেল—যারা ভাল শিক্ষা পেলে প্রকৃত মানুষ হতে পারতো। দেশের অনেকগুলো ভবিষ্যৎ আশাস্থল সাজলো নকল দেবদাস। কেউ ভাল মদের অভাবে ধরলো দেশীর আরাধনা, কেউ বা খেলে সায়নাইড্ আবার কেউ বা বিশ্রী বাড়ীগুলোর আনাচে কানাচে ঘুরে বল্‌লে—এসব করি কেন জান?—ভুলতে! 'দেবদাস' মরলো—মরলো, যদি মানুষের মত মরতো—তাহলেও প্রেমের সাথে দেশ আর একটা জিনিষ শিখতে পেত যে—আত্মক্ষয়ে গৌরব নেই, গৌরব আছে আত্মজয়ে। রস সৃষ্টি হয় না তাহলে। কিন্তু ভারতের মত ম্রিয়মান্ দেশের যা প্রয়োজন তা-ই পরিবেশন করাই তো উচিত সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। শুধু 'পথের দাবী' লিখেও শরৎবাবু অমর হয়ে থাকতেন।

নিজের লেখা লাইনগুলির দিকে চেয়ে চপল ভাবে—কিন্তু চপল বোস, তোমার কলম থেকে আজ একি সৃষ্টি। নাঃ, এ লেখা চপল ছিঁড়ে ফেলবেই, দেশকে ফাঁকী দিতে পারবে না। কিন্তু মনকে তুমি ফাঁকী দেবে কি করে চপলকুমার! ও নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে। মনকে ও কোন প্রকারে বোঝাতে পারে না। নাঃ, এর চেয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে কাজ দেবে বলে চপল বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু এতক্ষণেও ঘুম আসে কই! ওর মনটা যেন আজ হঠাৎ পাগলামী সুরু করেছে। চপল শুয়ে থাকতেই পারে না, উঠে পড়ে। খানিকটা পায়চারি করে নেবে ভাবছে, যেন পাশের ঘরের লোক না জাগে

আবার। পায়চারী করতে করতে ও কখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। কাঁচের গায়ে ওর মুখটা দেখায় খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্ট। তাইতো! ওকে যে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। মুখের শ্রী ফিরে গেছে, ঔজ্জ্বল্য গেছে বেড়ে, সবার ওপরে ওর কপালে চিবুকে মনোহারিত্বের ছাপ পড়েছে। নিজেকে কেহই কুৎসিৎ দেখতে চায় না একথা চপল মনে মনে বোঝে, তাই নিজের বিচার ও কঠিনভাবে করে, একেবারে নির্ম্মম। কেউ ওকে খুব সুন্দর বল্লে, এমন কি ডলির মত মেয়েও তা মাঝে মাঝে বলে, চপল আয়নায় চুল আঁচড়াবার সময় সেকথা মনে করে হাসে, ভাবে খোসামোদ করছে। কিন্তু আজ ওর নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে যে, চপলবাবু সুন্দরই দেখতে। এরকম প্রশস্ত ললাট আর দীপ্তিভরা চোখ কজনের আছে?

ডলির প্রশংসার কথা মনে হতেই ডলির চেহারাটা মনে পড়ে যায়। সুন্দরীই বটে তবে কেন জানি ওকে বরদাস্ত করতে পারে না—কাজ পণ্ড করবার গোঁসাই একটী। টাকা আছে তো ভারী বয়েই গেছে, বোগাস। প্রীতি? আরে রাম—ফ্যাসান করলেই যদি মানুষের সৌন্দর্য্য বাড়তো তাহলে তো ভাবনাই ছিল না! ওর হাসি পায় অঞ্জলি সোমের কথা মনে পড়াতে। উঃ কি মোটা! ওই মোটা চেহারা থেকে আবার গান! গেছি আর কি! সীতার চেহারাটা ভাবলে ভালই। মেয়েটার কাল্‌চারও আছে, তবে ভয়ানক লতিকা ধাঁচের—গা জ্বলে যায় টানা টানা কথা শুনলে। সোজাভাবে কথা বল্‌লে কি মহাভারত কোরাণ হয়ে যেত?

মীরা?—ওর বেশ মনে আছে দেখছি নামটা। বাস্তবিক বেশ

মিষ্টি নামটা। নামের সঙ্গেই দীপ্তিমাখানো। আহা বেচারা আমার একজন ভক্ত – আমার লেখার। হ্যাঁ, এইতো—শ্রদ্ধা করতে হয় তো আইডিয়াকে শ্রদ্ধা কর, ভালোবাসো তো সাধনাকে বাসো। তা নয় যত সব ন্যাকামো—আপনাকে এত ভাল লাগে চপলবাবু – কথাগুলো চপল বাঁকা করে মনের মাঝে উচ্চারণ করে।……মীরার চেহারায় একটা চাপল্য আছে—প্রাণশক্তির পরিচায়ক। ওইটুকুর মধ্যেই চপল দেখে নিয়েছে। কথার স্রোত বয়ে যায় মীরার মুখ থেকে। হ্যাঁ, প্রাণ খুলে কথা বলতে ও পারে হাসতেও—কোন জড়তা নেই ন্যাকামি নেই। নাঃ মেয়েটার সৎসাহস আছে সোজাসুজি কথা বলবার।

চপল ফিরে আসে আয়নার সম্মুখ থেকে। এসব কি ভাবছে ও! এতো ওর স্বভাব ধর্ম্ম নয়। আভিজাত্য আর ন্যাকামীর গ্যাস পোড়া এইসব বেলুন জাতীয় মানুষদের ও কোনকালেই পছন্দ করে না—মেয়েদেরও নয়—পুরুষদেরও নয়। ও বোঝে—ওরা চায় শুধু নিজের মেকী ঔজ্জ্বল্যকে জাহির করে পথরোধ করতে। অন্তর ওদের বিষ-বাষ্পে ভরা—কখন যে উড়ে যাবে নিজেরাই তার ঠিক নেই। স্থিতিশীল ভূমিতে ওদের স্থান নেই। চপল ওদের ভয়ই করে। ওদের সাথে মিশতে ওর কোনকালেই প্রবৃত্তি নেই, নিজেকে এটিকেটের বাঁধনে আড়ষ্ট করে বেঁধে চলতে পারে না ব'লে। ওর নিজের জীবন ছন্নছাড়া —যেন মুক্তবাতাস—যেখান সেখান দিয়ে ব'য়ে চলে, বাধা পেলে পথ বদলায় কিন্তু আবহ কমে না, গন্তব্যও বদলায় না। যখন যে খেয়াল চাপে তখন তাইই করে। চায়ের সাথে চেয়ে নেয় আলুভাজা, একটা

পায়জামা পড়েই হয়তো বা দিনদুপুরে দোকান থেকে সিগারেট কিনে আনে, পাঞ্জাবীর ওপরেই কোট চাপিয়ে ঠাণ্ডা কমায়।

চপল ভাবে—আচ্ছা মীরাও যদি ওই বেলুনগুলোর দলেরই হয়? তাহলে?……তাহলে আর কি? হুঁঃ, ভারী বয়েই গেছে—কি সম্পর্কটাই বা ওর সঙ্গে? একদিনের মাত্র আলাপ বইতো নয়—তাতে ভাববারই বা কি আছে? হলেই বা অভিজাত সম্প্রদায়ের চোরকাঁটা—পরীক্ষা করতে এসেছে নিজের হুল।

চপল জোরে জোরে পা চালাতে সুরু করে। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। পাশের ঘরে মা ঘুমুচ্ছে। নিশুতি রাত। ও সন্তর্পণে স্লিপার জোড়াকে খাটের নীচে ঠেলে দেয়—খালি পায়ে আর আওয়াজ আসে না। চপল ভাবে—হ্যাঁ, তাহলে চপলও দেখিয়ে দিতে পারবে মীরা কতখানি ভুল করেছে। সে দলের মানুষ ও নয়, রাস্তাঘাটে আজকাল যাদের দেখতে পাওয়া যায়, কোন মেয়ে হেসে কথা বললে যারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। নাঃ, ওর মাথা ব্যথাই বা কেন এত? সামান্য একটা মেয়ে এমন কত মেয়েই তো চলে গেছে ওর জীবন দিয়ে; কোনদিন কারুর কথা ও ভেবেছে কি? শিল্পীদের—বিশেষ করে যারা তরুণ, খানিকটা নাম যারা করেছে, তাদের সাথে এমনি কতজনই তো আসে সেধে আলাপ জমাতে। তা নিয়ে ভাবলে আর কি চলে? ও জানে—ওদের কেউ আসে নিজের জৌলুশ জাহির করতে—সাধ হয় তো নিজের বর্ণনা ফুটবে কগেজের পাতায়। কেউ বা আসে নিজের কদর বাড়িয়ে নিতে—'অমুক বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ আছে'—বন্ধু মহলে বলবার জন্যে।

নিজের যা তাই মনের আঁকা প্রেমপত্রে না লিখে কেউ বা ছাপার অক্ষরে পরোক্ষে মনের কথা জানাবার উপায় খুঁজতে আসে। এতে আর মাথা ঘামাবার কি আছে? ছোঃ অল্ রাবিশ্। এই মিস্ …মিস্ দূর ছাই ..মীরা সেনও হয়তো ওদেরি একজন—একটু সাবধানী এই যা। ওর সাথে দেখা হলে চপল ঠিক সোজা মুখের ওপর বলে দেবে—তোমার উদ্দেশ্য জানা আছে মহাশয়া—তুমি হাল্কা হাওয়ার রঙীণ প্রজাপতি, গাছে গাছে ঘুরে বেড়াও নিজের রূপ দেখিয়ে। কিংবা হয়তো চাও -আমাকে অর্থাৎ শ্রীমান চপলকুমারকে খানিকটা উত্তপ্ত করে দেখতে গরম কড়ায় দেওয়া ধানের মত নাচতে পারি কিনা। কেমন, এই না তোমার অভিপ্রায়? কি গো মীরা দে…বী—উত্তর দাও? কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির এই যে পথ -যে পথ ধরে তুমি পা ছাড়াতে চাইছো, সেখানে হয়েচে ভুল দিক নিরূপণের বেলায়। কারণ তোমার জানা উচিত ছিল, যদি তুমি বাস্তবিক দক্ষ পথিক হয়ে থাক, যে চপল বোস সে ধরণের বস্তু নয় যে অল্পেতেই যায় গ'লে; একতাল কাদার মত, অথবা যা খুসী তা বানানোও চলতে পারে। চপল বোসকে গলানো অত সহজ হবে না মিস্ সেন কুমারী মীরা সেন। চুণকে গলাতে গেলে যেমন হয়, যদি অবশ্য তদুপযুক্ত যথেষ্ট জল থাকে তোমার, চপল বোসকে গলাতে গেলেও পড়বে একই অবস্থায়। চপলের অন্তর বাহির সবই সাদা চুণের মত, কিন্তু আছে অন্তর্নিহিত উত্তাপ। জল আছে বলেই নির্ব্বিঘ্নে ওকে গলানো যায় না। ও ফেটে পড়বে তাহলে আগুণকে উদ্গীরণ করতে করতে—যা সামলাতে গিয়ে তোমার নিজের হাতই পুড়বে। তাকে দিয়ে বানানো

চলবে না যথা ইচ্ছা পুতুল--যাকে নিয়ে খেলা করা চলে। সাবধান মীরা সেন এখনো পথ বদলাও।

চপল আবার কখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে ও নিজেই চমকে ওঠে। একি! লাল হ'য়ে উঠেছে যে ওর সারা মুখখানা! চপল ভাবে—ওকি ক্ষেপে গেল নাকি? কি আবোল তাবোল ভেবে চলেছে! মীরা সে ধরণের মেয়ে নাও হতে পারে। হয়তো বা অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে, স্বচ্ছ যার জীবনধারা। লেখাপড়া শিখে হয়তো বা খানিকটা মার্জ্জিত হয়েছে। সত্যিকারের প্রয়োজন কিছু থাকতে পারেও বা। তর্কের জোয়ারে নিজেকে তরঙ্গের নাগর দোলায় চাপানো সখ বোধ হয়। যাক্, তবু ঐ করে কিছু শিখতেও পারবে—বিষাক্ত ফ্যাসান শেখার চেয়ে ঢের ভাল। নিজের এক কৌলিক মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও সখ নিবৃত্তি লাভ করবে—তখন এই পরিচয়ের সুত্র যাবে ছিন্ন হয়ে —সেই ভাল—বাবা।

ব্র্যাকেটে টাঙানো জামার পকেট থেকে মীরার দেওয়া কলমটা উঁকি মারে। চপল সেটাকে নিজের অজান্তেই খুলে নিয়ে আসে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটাকে দেখে চপল ভাবে—মেয়েটার বাস্তবিক টেষ্ট্ আছে। ভাগ্যিস্ কাল সেন্টের শিশি কিনে দেয় নি বা এক তোড়া ফুল। হুঁঃ, ডলিটা কি বোকা—নিয়মিত ফুলের তোড়া দিয়ে ভাবে চিত্তজয় করবে। আরে, আমার চিত্তব্যাপী বিরাজ করছে মাত্র একটা জিনিষ—সাধনা, একাগ্র সাধনা—সাহিত্য সাধনা, জাগরণের সাধনা; ডলি একদিনও কি বুঝতে পারে না যে, ফুলের তোড়াগুলো পরক্ষণেই

দাদার ঘরে চালান যায়? মীরার সাধনা-প্রবণ মন আছে। কি করে জানতে পারলো যে আমার কলম কেনার বাতিক আছে! মাত্র দুটো কলমে মন ভরে না। মাঝে মাঝে মনে হয় যদি একশোটা হাতে একশোটা কলম ধরে একই সঙ্গে লিখে যেতে পারতো তাহলে সান্ত্বনা পাওয়া যেত খানিকটা—মাঝে মাঝে এমনই উদ্দাম হয়ে ওঠে ভাবস্রোত—মীরার ইচ্ছা বোধ হয় আমার সাহিত্য-সাধনা আরো সাবলীল হোক—বেশ মেয়ে। আয়নার মাঝে চপলের চোখদুটো স্তিমিত হয়ে আসে। হঠাৎ লাফিয়ে সরিয়ে আনে ওর দেহটাকে। কি আশ্চর্য্য! এসব কেনই বা ভাবছে ও? সামান্য পরিচয়—পাতলা জলের মত, একটু কাৎ করলেই গড়িয়ে পড়ে যাবে। নাঃ চপল বোসের মাথা ঠিক নেই আজ। এইজন্যেই তো চপল লোকজনের ভিড়ের মধ্যে যেতে চায় না।

চপল পা দুটোকে জোর করে টেনে আনে বিছানার ধারে। তারপর ঝপ্‌ করে শুয়ে আলো নিভিয়ে দেয়। যাক্‌ বাঁচা গেছে বাবা। ওর মাথায় নিশ্চয়ই ভূত চেপেছিল এখন। ও ঘুমুবে এবার সত্যিই।

বালিশের মধ্যে মাথা গুঁজে চপল চুপ করে শুয়ে থাকে। বাঃ, ঘুমও কি ওর সঙ্গে রাগারাগি করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে? ও মনে মনে এক দুই গুণতে সুরু করে—কিন্তু অবাধ্য ছেলের মত মনটা খালি অন্যদিকে চলে যেতে চায়। অন্ধকারের মধ্যে ও চোখ দুটোকে মেলে ধরে। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্নার যেটুকু আলো এসে পৌঁছেচে—মশারীর ভিতর দিয়ে তাকে দেখা যায় রহস্যময়। নিবদ্ধদৃষ্টি খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে ও আবার চোখ বোজে। সামনে

ভেসে ওঠে কত কি ছবি কত কথা।…সাহিত্যসভা, বলবার জন্য ওর উঠে দাঁড়ানো স্পন্দিত বুকে, কথার জাল বোনা—সবই যেন তার কাছে এখন অপরূপ মনে হচ্ছে। বাঃ বেশ বলতে পারে তো! যুক্তিতর্কের নীরেট গাঁথুনী দিয়ে গেঁথে গেছে ওর বক্তব্যের ইমারৎ।……নমস্কার! ……আপনার লেখার আমি একজন ভক্ত……বাঃ আসুন…সে কি কম লাভ?—চোখের সামনে ভেসে ওঠে সমস্ত ঘটনাগুলো বায়স্কোপের ছবির মত। আর ছায়ার রহস্যময় পর্দার ওপর মনের মেসিন থেকে যেন লাইট্ ফোকাস্ করা হয়েছে—সেখানে দর্শক মাত্র ও নিজে, অপারেটারও, আবার অভিনেতাও।

…এটা যে মৌলালীর মোড়……বসুন একটু…ওর ঘ্রাণের মধ্যে যেন ভেসে আসে মিষ্টি গন্ধ। যাবার সময় মীরা যেন অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল ওর দিকে, সে সময় খেয়ালই হয় নি। রাতের অন্ধকারে নীরবত্বের অভিধানে যেন তার অনেকগুলি অর্থ রয়েছে দেখা যায়।

…ফোন্ নাম্বারটাও রেখে গেলাম—ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা বাংলো ধরণের ছোট খাটো বাড়ী—রাস্তার দিকে মুখ কর গেট্ দিয়ে ঢুকতে লাল কাঁকর মাড়িয়ে যেতে হয়। আশপাশের ফুলগাছগুলি মাথা উঁচু করে ডিঙি মারবার চেষ্টা করে। ফুলগুলি হেসে হেসে যেন কথা কয়, বলে—যাচ্ছেন কোথায়? আমাদের ঘর সংসার দেখে যান। ওই দেখুন—আই-ভি দেবী নিজের বিছানা বিছিয়েছেন গেটের ওপর, সাহস আছে বাবা! ওখান থেকে উনি নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করেন। ওই যে মিসেস্ ম্যাগ্নোলিয়া—চারটীতে

মিলে এখানে ঘর বেঁধেছেন, তবে থাকেন দূরে দূরে—নীরবতা পছন্দ করেন কিনা তাই। সন্তানসন্ততি ওঁদের খুব কম, ইউরোপীয় সংযম ওদের মধ্যে। তাই ছেলেগুলির রূপগুণ হিংসা করবার মত—লোকে আদর করে, বাহবা দেয়। ওখানে ওই যে রোগা মেয়েগুলি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—কেউ রয়েছে লজ্জায় মাথা গুঁজে, কেউ বা ঈষৎ হেলে, কেউ বা অবাক্ হয়ে চেয়ে—ওরা ভারী ভাল মানুষ। দিনের বেলায় একগলা ঘোমটা দিয়ে থাকেন, আর রাতে মুখের মিষ্টি গন্ধে পথিককে পর্য্যন্ত পাগল করেন। ওঁরা বঙ্গের বধূ বুকভরা মধু—সাদা-সিদে মানুষ, নাম রজনী-গন্ধা। এইবার এদিকে চেয়ে দেখুন—মিস্ প্যান্সি চেয়ে আছেন আপনারি দিকে—কৌতুহলী দৃষ্টি, ভায়লেট্ রঙের গাউন্ পরেছেন। ওই যে বেলা দেবী ওদিকে হেসে খুন হলেন আপনাকে দেখে। মিস্ ডলিও ওধারে আড়াল থেকে দেখছেন—চালাক্ মেয়ে বাবা। আর ওঁদের পরিচয় তো জানেনই—মোগল আমল থেকে এদেশে বাস করছেন। গুণীমেয়ে তাই রাণী করে রেখেছি। মনে থাকবে আমাদের সবাইকে? মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন আমাদের অভাব অনটন যদি কিছু থাকে। মেয়ে মানুষ বলে লজ্জায় বড় কিছু বলতে পারি না কাউকেই। গাড়ীবারান্দা দিয়ে উঠে যান, আরো অনেক কুমারীদের দেখতে পাবেন। নামগুলো আগে থাকতে বলে দিই, চিনে চিনে কিছু আলাপ করে যাবেন। গোড়া থেকে সিঁড়ি বেয়ে পরপর দাঁড়িয়ে আছেন—পিচেটীয়া, পাম্, ডালিয়া, এ্যারিস্কা, লিলি।

ফুলকন্যাদের পরিচয় নিয়ে চপল সোজা ভিতরে ঢুকে পড়ে।

ঝক্‌ঝকে ছোট্ট একখানি বাড়ী—বেশী আড়ম্বর নেই। সামনেই ড্রইং রুমটায় কয়েকটা সোফা, তিনটে কুশ্‌ন্‌, ইজিচেয়ারও দুটো, দুইসাইজের দুটো মার্ব্বলটপ টেবল্‌—চারিদিকে খান কয়েক করে এমনি চেয়ার। দেয়ালে টাঙানো কয়েকটা সস্‌-পেন্টিং দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশেষভাবে। ফটোগুলো কার? মীরার বাবার বড় অয়েল পেন্টিংটা সামনেই বিরাজমান। বাঃ বুদ্ধের মূর্ত্তিটা তো বেশ চমৎকার। লাইট্‌গুলোর শেড্‌ ওর পছন্দ হয় না কিন্তু, ও ভালোবাসে একেবারে শাদা। চপল এবার পূর্ব্বদিককার ঘরটায় ঢোকে। এটা মীরার ষ্টাডী নিশ্চয়ই। বাঃ, অনেক বইপত্তর দেখছি রিভলভিং বুককেসে সাজানো। মাঝে ছোট গোছের একটা সেক্রেটারিয়েট্‌ টেব্‌ল্‌। খোলা র‍্যাক্‌টায় সাজানো বাঁধানো মাসিক পত্রের গাদা। বেঁটে গোছের চওড়া আল্‌মারীটা থেকে উঁকি মারছে অজস্র ইংরাজী বই—বাইরন্‌, টেনিসন্‌, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, হুইট্‌ম্যান্‌, সুইন্‌বার্ণ পর্য্যন্ত। ওধারে কীট্‌স্‌, কাউপার, গোল্ডস্‌মিথ্‌। ওগুলো কি পেঙ্গুইন্‌ আর পেলিক্যান্‌। ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ছবির বইটাও কিনেছে দেখছি—টাকা থাকার কি সুবিধা। ল্যাম্বের বইও মীরা পড়ে নাকি! আহা! মোপাসার পাশে ওয়েল্‌স্‌ রেখেছে কেন? ও, এ থাকটায় সব রাশিয়ান্‌ বুঝি? বাঙলা বইএর আলমারী ওটা। নাঃ বেছে বেছে কিনেছে দেখছি—শুধু নাম দিয়েই পেট ভরায়নি। এই যে চপল বোস তোমার চারখানা বইই রয়েছে দেখছো? মীরা তোমার ভক্তই বটে। এত বই দেখে চপলের বুক থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে নিজেই চম্‌কে উঠে ও ভাবে—উঃ কল্পনায় কতদূর পৌঁছেছিল। কোথায়

মীরাদের বাড়ী আর কোথায় বা বইএর আলমারী ! নিজের মনে যে সব জিনিষ ও ভালোবাসে চপল কল্পনাবশে সেই সব জিনিষই দেখে চলেছে। মাথাটা যেন টিপ্ টিপ্ করে।

রাত এতক্ষণে ভোরের দিকে পা বাড়িয়েছে। হয়তো এক্ষুণি শুনতে পাওয়া যাবে বাসের হর্ণ, রিক্সার ঠুন্ ঠুন্। কি বিশ্রী লাগছে ওর শরীরটা। সারারাতটাই ও কাটিয়ে দিল যত সব বাজে কল্পনা করে। কেন এই সামান্য মেয়ের জন্য ও ভাববে এতক্ষণ ? নিজের এই অসংযমের জন্য ও নিজেকে শত ধিক্কার দেয়। ভাবে—চপল বোস, তুমিও এত দুর্ব্বল। কি সব অলীক কল্পনা করে চলেছ তুমি ? চপল নিজেকে চিরে চিরে বিচার করে দেখতে বসে।

বাড়ীর ঘড়িটায় বেজে গেল—এক, দুই, তিন, চার। চপল উঠে দাঁড়াল। বাইরে থেকে মুখ হাত ধুয়ে খানিকটা ঠাণ্ডাজলের ঝাপ্টা লাগাল কানদুটোয় আর ঘাড়ে। উঃ কি তৃষ্ণাই ওর পেয়েছিল। তৃষ্ণার জলটুকু, যা সে রোজ রাত্রে শোবার আগে খেয়ে শোয়, তাও খেতে ভুলে গিয়েছিল। এমনি ওর মতিভ্রম ঘটেছে ! গ্লাসের পুরো জলটা গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে চপল ক্যাম্প্ চেয়ারটায় বসলো চুরুট ধরিয়ে। চুরুট টানতে টানতে ও চেয়ারটার কোলেই এলিয়ে পড়লো।

অষ্টম পর্য্যায়

পরের দিন সকালে চপল যখন শয্যাত্যাগ করলো তখন অনেকখানি বেলা হয়ে গেছে। ভোরের দিকে কখন ও নিজেই বিছানায় গিয়ে শুয়েছে তা নিজেরই মনে পড়ে না। সূর্য্যের উন্নতি কোণ তখন প্রায় তিরিশ্ ডিগ্রী। চোখমুছে চপল বিছানা থেকে নেমে এসে ক্যাম্প্-চেয়ারটাতেই ধপাস্ করে বসে পড়লো। ওখানে বসতেই ওর মনে পড়ে গেল গত রাত্রির কথা। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে যা ওকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল, দিনের আলোকে তা গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। ওর নিজেরই এখন বেজায় হাসি পাচ্ছে গত রাত্রিটার কথা ভেবে। ওর মন এখন সম্পূর্ণ সরল ও নিরাসক্ত। ও এখন ঠিক সেই চিরন্তন চপল বোস—যার সাথে মা ছাড়া দুনিয়ায় আর কারুর সাথে কোন অন্তরঙ্গতা নেই। দেশের আগামী সাহিত্য ধারার যে ভগীরথ তাকে কেউই চেনে না। ও ইচ্ছা করেই ধরা দেয় নি। কত মেয়ে সেধে ওর বাড়ী এসে আলাপ করে ধন্য হতে চেয়েছে, দেখিয়ে গেছে আন্তরিকতার অভিনয়, কাগজে টুকে দিয়ে গেছে নিজের নাম ঠিকানা ফোন্ নাম্বার, অথচ পরক্ষণেই ও গেছে সব ভুলে। ঠিকানা লেখা কাগজ উড়ে গেছে রাস্তায়, না হয় আশ্রয় পেয়েছে জঞ্জালের গাদায়। কিছুদিন বাদে দেখা হলে দীপ্তিকণাকে ডেকেছে প্রীতিলতা বলে—আর প্রীতিকে কল্যাণী মজুমদার বলে। মিস্‌কে আহ্বান করেছে মিসেস্ বলে—আর

মিসেস্‌কে মিস্। মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করেনি। কেউ কেউ মনে ভেবেছে ওয়াইল্ড্, আর কেউবা বলেছে গেঁইয়া কোন কাজের নয়। প্রীতির মত মেয়েরা বলেছে—কোল্ড আর ইম্‌পোটেণ্ট। শ্যামলী রায় আলোচনা করেছে কল্যাণী আর আরতির সঙ্গে—ও দেউলে, ওর সব কিছু বাঁধা পড়েছে অন্যের কাছে—যার রূপের সিন্দুকে চোখা চোখা প্রেমের বুলির তালা দেওয়া লুকানো আছে ওর পৌরুষের দলিলটা। কড়া পাওনাদার—আদায় করে নিতে জানে নিজের পাওনা গণ্ডা, তাই মহাজনী খাতায় নাম সই করিয়ে রেখেছে ওকে চিরকালের জন্য বাঁধা। প্রীতি সন্দেহ করে ছায়াকে—আর ছায়া ডলিকে দেখে জ্বলে মরে। চপল এসবের কোন খোঁজই রাখে না—রাখবার মত মনের গড়ন নেই। চপল ডুবে থাকে নিজের ভাব সলিলে।

চেয়ারের ভিতর ও একবার পাশ ফিরে নেয়—সারা দেহে ক্লান্তি আর জড়তা। শরীরটা যেন ভেঙে পড়তে চায় কাঁচের পুতুলের মত, ভিতরে ভিতরে যেটা শতটুক্‌রা হয়ে গেছে, ওপর থেকে রাখা হয়েছে বেমালুম জোড়া দিয়ে।

মা এসে ঘরে ঢুকলেন। ছেলের চেহারা দেখে তাঁর সন্দেহ জাগলো—তাই জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে, অমন করে বসে আছিস্ যে!

এমনি আর কি—চপল মিট্‌ মিট্‌ করে চেয়ে বল্লে।

—এত শুকনো দেখাচ্ছে যে তোকে? অসুখ করেনি তো?

—কেন, বেশ আছি তো—কপালে হাত ঠেকিয়ে ও উত্তর দেয়। সত্যি, ওর জ্বর হলো নাকি? মুখে বলে—এইতো কপাল বেশ

ঠাণ্ডা। কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ভাল ঘুম হয়নি কিনা তাই।

মা মশারী তুলতে তুলতে জিজ্ঞাসা করেন—কি স্বপ্ন রে?

চপল বলে—উঃ মাগো, সে কি বিশ্রী স্বপ্ন তোমায় আর কি বলবো।

মা হাস[illegible]াসতে বলে—কি বলই না শুনি।

চো[illegible] বড় বড় করে চপল বলে—উঃ, কি প্রকাণ্ড একটা পেত্নী—ইয়া লম্বা হাত পা, বুঝলে মা, চোখ দুটো ভাঁটার মত। সেই ভুতটা একটা ট্যাক্সি থেকে নামলো। প্রকাণ্ড গাড়ী, তবু ঐ লম্বা হাত পা কি তার ভিতর ধরে! রাস্তায় যেই নামা আরো বড়, আমার ঘড়ে এসে আরো বড়।

মা কৃত্রিম ভয়ের ভান করে জিজ্ঞাসা করলেন—বলিস্ কিরে! তারপর?

—তারপর? আমার কাছে এসে বল্লে—তোমায় আমি খাবো। জিজ্ঞাসা করলুম—কেন, আমি কি করলুম? পেত্নীটা বল্লে—ভূত পেত্নীদের তুমি দেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছো তোমার কলমের খোঁচায়; দেখ দিকি আমার গায়েও কি রকম খোঁচাটা লেগেছে। আমাদের গল্প তুমি লেখনা কেন, ছেলেপিলে পড়ে আনন্দ পেত, আমাদের দল ভারী হত। সেইজন্যে আমরা ঠিক করেছি… …

মা বল্লেন—নে নে হয়েছে তোর ভূতের গল্প, তুই নিজে যেমন একটা জ্যান্ত ভূত। ওঠ, মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে নে।

চপল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। মাকে ঘুরিয়ে কথা বলে ওর

মনে খোঁচা বেঁধে—এই স্থরু হলো নাকি লুকোচুরি? পেষ্ট্ আর ব্রাশ্ হাতে করে চপল বেরিয়ে যায়—মার স্থমুখ থেকে চলে যেতে পারলে যেন ও বাঁচে।

মুখ ধুয়ে ও শীঘ্রই ফিরে আসে। মা ইতিমধ্যেই ওর চা জলখাবার টিপয়টার ওপর রেখে গেছেন। শরীরটা ওর জলভরা গ্লাস, নড়াচড়া করতে গেলেই যেন চল্‌কে পড়ে যাবে, তার চেয়ে এক জায়গায় বসিয়ে রাখাই ভাল। চায়ের কাপটা হাতে করে তাই আবার সেই চেয়ারেই বসে। চায়ে আর চুরুটে টান দিয়ে ও খানিকটা তাজা হয়ে ওঠে। গত রাত্রের ভূতের স্বপ্ন ওর মন থেকে মিলিয়ে গেছে। চা পান শেষ করে চপল এইবার আপন টেবিলে এসে বসে। কাগজ-পত্রগুলি কিছু কিছু নিজেই গুছিয়ে নেয়। তারপর র‍্যাক্ থেকে একটা বই বার করে চোখ দুটোকে মেলে দেয় তার পাতায়। —সঙ্গে সঙ্গে ওর মন রাশিয়ার এক প্রান্তে গিয়ে বাসা বাঁধে।

মুহূর্ত্তগুলি পা ফেলে চোরের মত অজান্তে এগিয়ে চলে। চপলের কাছে বাহ্যজগৎ এখন লুপ্ত। কৃষকজীবনের সমস্যাগুলি ওর চোখের সম্মুখে বাস্তব রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে—যার পরিণতির দিকে ওর মন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। মা এসে খবর দিয়ে যান—চপল, তোকে বাইরে কে একজন ডাকছে দেখে আয়।

চপল ভাল করে শুনতেই পায় না। মা ফের বলেন—কই, শুনতে পেলি আমার কথা? হুঁ বলে চপল পাতা উল্টে চলে। ওর মা ফের বলেন—কই, উঠ্‌লি নে?

—কি?...

—হুঁস্ হলো এতক্ষণে ?

—হুঁ, হলো ; যাও বিরক্ত করো না।

—বিরক্ত তো তোমাকে নিত্যই করছি। নাও এখন দয়া করে উঠে বাইরে কে ডাকছে দেখবে একবার ?

চপল পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলে—কেন ? উঃ কি জ্বালাতনই যে কর তোমরা।

মা এলেন, বল্লেন—কি যে বাপু রাতদিন বই নিয়ে পড়ে থাকিস্ বুঝতে পারি নে। কাজ কর্ম্ম নেই কিছু নেই, পড়ে পড়ে উনি রাজ্য জয় করবেন। এখন বাইরে কে ডাকছে একবার দেখে আয়।

পড়ে যেতে যেতে চপল বলে – কে বল দেখি ?

—তা আমি কি করে জানাবো বাপু? রাজ্যের ছেলে মেয়ে তোমার খোঁজে আসবে, আমি কি তাদের সবাইকে চিনে রেখেছি নাকি।

—সত্যিই ডাকছে তাহলে, এ্যাঁ ? আচ্ছা, আর কাউকে নয় তো ?

ওর মা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলেন—চপলবাবু আপনারই নাম তো ?

চপল হেসে ফেলে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলে—কে ডাকছে নামটা জিজ্ঞাসা করলে না কেন ? মাটী করলে দেখছি সব। সেই প্রীতি না যুঁথী মেয়েটা নয় তো ? তাহলেই আজ সব গয়া। মার দিকে তাকিয়ে ও বলে—আচ্ছা মা, ওরা আমাকে এই জ্বালাতন করতে আসে কেন বলো তো ? তুমি মানা করে দিতে পার না ? একটু

কাজের মানুষ হও দেখি। এইবার কেউ ডাকলে ব'লে দিও—বাড়ী নেই, কেমন? আ···র না হয় আমাকে একটু খবর বলে দিও আগে ব্যস। এমন জায়গায় লুকোবো টেরও পাবে না।

ওর মা হেসে ফেলেন! ওরা কেন যে আসে তা উনি বোঝেন, আর সেই জন্যে মনে মনে গৌরব বোধও করেন।···বাইরে থেকে আবার ডাক আসে।

চপল বাইরে এসে দেখে—মৃণালবাবু এসে হাজির। মৃণাল মুখুজ্যে—আদব কায়দা আর ফ্যাসানে ফোলানো পুরুষ নিজের টুসীটারে টহল দিয়ে বেড়ান সারা কলকাতা সহর। পরিচয় ও সূত্র—এ্যাংলো পাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত মাড়োয়ারী মহল থেকে সুরু করে। জমার খাতায় মোটা অঙ্ক, নিত্য চলে সুদ কষা আর তারি 'মিলনী'র সেক্রেটারীত্ব।

—এই যে চপলবাবু, সুইট্ মর্ণিং।

নমস্কার,—বলে চপল হাত তোলে।

মৃণালবাবু কার থেকে নেমে এসে বলেন—এক কাপ চা না খেয়ে যাচ্ছি না কিন্তু।

চপল হেসে বলে···নিশ্চয়ই বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে ডাকে—মা! তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলে—চলুন, ভিতরে বসা যাক্। নিজের ঘরে মৃণালবাবুকে বসিয়ে চপল নিজে ভিতরে চলে আসে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবে—কি ফ্যাসাদই বাধলো দেখ; এমন বইটা মাঠে মারা গেল। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ও মৃণালবাবুকে এড়াবার উপায় খুঁজতে থাকে। একবার ভাবে-খবর দিই যেতে যেতে

পড়ে গিয়ে এ্যাক্সিডেণ্ট্। সর্ব্বনাশ, তাহলে হয় তো মৃণালবাবু বলে বসবেন—বলেন কি! চলুন দেখে আসি, ডাক্তার আনি। নাঃ, তবে? লুকিয়ে পড়া যাবে কোথাও? তাও তো হয় না দেখছি।

মা ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেন—কি হে বাবু, এক্ষণে একলা দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে? ছেলেটা চলে গেছে?

ওর সমস্ত রাগটা মার ওপর গিয়ে পড়ে, বলে—হ্যাঁ হাতী গেছে।

—হাতী গেছে কিরে!

—গেছে কোথায়: হাতীর মত জাঁকিয়ে বসেছে, নড়বার নামটী নেই। তুমি কেন বলে দিলে না যে আমি বাড়ী নেই?

—তুই কি আমাকে মিথ্যাবাদী সাজাতে চাস্ নাকি বুড়ো বয়সে?

চপল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, বলে—বাঃ, আমি তাই বলেছি নাকি?

—তবে কি বলছিস্ তুই! ঘরে থাকতেও বলে দেব বাড়ী নেই? মিথ্যা কথা বলা হবে না তাহলে?

মাথা চুলকে চপল বলে—তাইতো……আচ্ছা আমি কি করতে এসেছিলুম বল দেখি?

—তা আমি কি করে জানাবো বাপু? কাজের তো তোমার অন্ত নেই। ভদ্রলোকের ছেলেকে ঘরে বসিয়ে রেখে উনি এসেছেন এখন কাজ সারতে।

চপল মাকে ফাঁকি দিয়ে বলে—খুব বাঁচিয়েছ, মা, বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম। মৃণালবাবু বল্লেন চা খাওয়াতে।

—ওরে হতভাগা ছেলে! এখানে দাঁড়িয়ে তাই গবেষণা হচ্ছে? তুই গল্প করগে যা একটু, আমি এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চপল নিজের ঘরে ফিরে আসে ; মৃণালকে দেখে বলে (গল্প করতে হবে বলে)—কি, বসে আছেন একলা ?

মৃণাল মুখ তুলে বলে—তাইতো দেখছি। কি করা যায় বলুন ? আপনার তো আর ফিরবার নামই নেই। কি আর করি বসে বসে তাই দেখছিলাম বই পত্তরগুলো। আচ্ছা, সাহিত্যিক, তাই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে।

চপল জিজ্ঞাসুদৃষ্টি মেলে বলে—বলুন, নিজের ধারণায় যা বিশ্বাস করি সেইমত উত্তর দেব।

মৃণালবাবু লোটান কোঁচাটাকে কিছু সম্বৃত করে নিয়ে বল্লেন—আচ্ছা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যিনি মহীরুহের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়ান, বলতে হবে তিনি প্রতিভাবান্ ব্যক্তি। কিন্তু এই প্রতিভা জন্মগত প্রাপ্তি, না সাধনা-লব্ধ সৃজন ?

চপল মৃণালের প্রশ্নে একটু স্তম্ভিত হয়ে গেল—কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্ত মাত্র। তারপর ধীরকণ্ঠে বল্লে—আপনার প্রশ্নটা এমন যার উত্তর ঠিক সোজাসুজি দিতে গেলে বিপত্তি বাধতে পারে, মানে সকলের ধারণার সঙ্গে ঠিক না মিলতেও পারে। তবে বলেছি তো আমার নিজের ধারণার কথাই বলবো অনেক প্রতিভার বিশ্লেষণকেও অগ্রাহ্য করে। আমাদের অধিকাংশ লোকের ধারণা প্রতিভা শুধু জন্মগতই—যার সমর্থনে তাঁরা বলে থাকেন যে—প্রতিভা যদি জন্মগতই না হয় তাহলে পচা পাড়াগায়ে জন্ম নিয়ে লেখাপড়ার ধার না ধেরেও গদাধর চট্টোপাধ্যায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ হতে পারতেন না—যাঁর চেষ্টায় দেশের প্রথম জাগরণের সূত্রপাত। ওদের দেশের একজন পণ্ডিতব্যক্তিও সে

কথা লিখে ফেল্লেন কাগজে। বার্নার্ডশ-এর চোখে পড়লো সে কাগজ। তিনি তার উত্তর দিলেন বড় নির্ম্মমভাবে। জন্মগত প্রতিভাকে ডিমের সঙ্গে মিলিয়ে প্রচার করলেন—প্রতিভা জন্মগত নয়, প্রতিভা সাধনা-লব্ধ কৃষ্টির ফল। কিন্তু আমার নিজের ধারণা একটু অন্য প্রকারের। আমি মনে করি—প্রতিভা জন্মগতও বটে আবার সাধনালব্ধও বটে। সাধনা না থাকলে 'জন্মগত' অন্ধকারের কুক্ষিগত, আবার 'জন্মগত' না থাকলে সাধনা শুধু মার্জ্জনাই হয় যার একমাত্র ফল শুধু ক্ষয়, স্থিতিশীল ঔজ্জ্বল্য নয়। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব আধখানা জন্মেছিলেন আর আধখানা আত্মসৃষ্ট। রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার পূর্ব্বে দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ তাঁর পিতাঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে সাধনোচিত জীবন যাপন করেছিলেন। মহর্ষির সে সাধনা রবীন্দ্রনাথ জন্মগত ভাবেই পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে নিজের সাধনা সংযুক্ত হয়ে তিনি হয়েছিলেন বিশ্বকবি বাংলার রবি। ফুল হলেই মালা হয় না, আবার মালা গাঁথার শিক্ষা ও সাধনা থাকলেই কাগজের ফুল মালিকার কেউ সম্মান দেয় না, সেখানে জন্মগত ও স্বভাবজ ফুলের প্রয়োজন।

মৃণালবাবু মৃদু হেসে বল্লেন—আপনি চিন্তাশীল সন্দেহ নেই, কিন্তু চতুরও।

চপল হেসে উঠলো—সরল, প্রাণখোলা হাসি। মৃণালবাবু সে হাসিতে যোগ দিয়ে বল্লেন, আপনি যে চিন্তাশীল, এবং দৃষ্টি-ভঙ্গী যে অপরের দৃষ্টির অনুসরণকারী নয় তা আপনার বই পড়লেই বোঝা যায়। অপ্রাসঙ্গিক হলেও আর একটা কথা বলি—আপনার পাঠক শ্রেণীর

একটা প্রধান অভিযোগ এই যে—আপনি যুবক যুবতীর প্রেমকে বড় বক্র দৃষ্টি দিয়ে দেখেন। যুবক যুবতীর প্রেম মানেই কি মোহ মাত্র?

চপলের চোখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল! চশমাটাকে মুছতে মুছতে চপল বল্‌ল—আমি তা কথনই বলিনি মৃণালবাবু এবং প্রেমকে সে চোখে দেখিও না। বর্ত্তমান আধুনিকতার স্রোতে ভাসমান যুবক যুবতীর প্রেমকে বক্র দৃষ্টিতে দেখলেও মানব মানবীর প্রেমকে আমি চিরকাল শ্রদ্ধার চোখেই দেখি। সত্যকার প্রেমের ক্ষমতা অসীম। সে চলতে জানে, ভালবাসা শেখাতেও জানে। প্রেম আমি তাকেই বলি—যে পথরোধ করে দাঁড়ায় না, পথকে প্রশস্ত করে দিয়ে বলে—এগিয়ে চলো। পিছন থেকে হাতছানি দেওয়া তার ধর্ম্ম নয়, সুমুখ থেকে হাত বাড়ানো তার অভ্যাস। কিন্তু সে প্রেম যে কোটীতে একটা মেলে মৃণাল বাবু। বাদ বাকী যাকে আমরা প্রেম বলি তাকে স্বার্থ ছাড়া আর কি আখ্যা দেব বলুন? সত্যকার প্রেম অতি দুর্ল্লভ বলেই তার এত গৌরব—যার নাম ভাঙিয়ে প্রেমের অভিনয় বেশ চলেছে বাজারে। প্রেমের সব থেকে বড় অবদান—[illegible] ব্যথা মানবতার জীয়ন কাঠি। মানুষ ব্যথার পাগল।

মৃণাল অবাক্ হয়ে বলে মানুষ ব্যথার পাগল!

—হ্যাঁ মৃণালবাবু, মানুষ ব্যথার পাগল। আমার মনে হয় এই মানুষ জাতটাই বোধহয় সর্ব্বপ্রথম ব্যথার গর্ভে জন্ম লাভ করেছিল, তাই সে তার আদি জননীকে পাগল হয়ে খুঁজে বেড়ায়। কথাটা হয় তো আমার হেঁয়ালীর মত ঠেকেছে, নয়? কিন্তু সত্যিই বিচার করে দেখুন—মানুষ সুন্দরের উপাসক এবং যা কিছু সুন্দর তা ব্যথা

দান কি না। আপনার বিজ্ঞানের দান পর্য্যন্ত। ব্যথা থেকেই জন্ম লাভ করলো কবিতা। নিবিড়তর ব্যথা সুর হ'য়ে তাকে স্পর্শ করে জন্ম দিল গানের—মানুষ অপরূপকে পেল সেই ব্যথা-ঘন গানের ভিতর দিয়ে। রাধার হৃদয়-ব্যথা আজো গান হয়ে আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। আপনার বৈজ্ঞানিক দূরত্বের ব্যথায় পাগল হলেন, তাই সৃষ্ট হলো—টেলিগ্রাফ্. রেলওয়ে এরোপ্লেন পর্য্যন্ত। এই মানুষেরই কোন আদিপুরুষ অপরের বা নিজের প্রিয়জনের ব্যাধি দেখে ব্যথা পেলেন অন্তরে মনে, সৃষ্ট হলো—চিকিৎসা শাস্ত্র। রামী কাঁদাল চণ্ডীদাসকে, সে কাঁদন আজো অমৃত বর্ষণ করে। এমন কি আপনার কৃপণ ধনী সেও অতৃপ্তির ব্যথার প্রেরণায় অর্থ সঞ্চয় করে চলে। মানুষ হাসে তার অর্থ বুঝি না, মানুষ কাঁদে তখন বুঝতে পারি ওর হৃদয়ের অগ্নি শুদ্ধি হচ্ছে। আপনি যদি বলেন—বড় সুখে আছি, তাহলে বুঝি আপনি হয় মিথ্যা বলছেন, নয় সুখ কাকে বলে জানেন না। কিন্তু যখন—বলেন—চপলবাবু, উঃ বড় কষ্ট, তখন আপনার বুক-চেরা দীর্ঘ-শ্বাসই বলে দেয়—আপনি সত্য বলছেন—আর নিজেকে চিনতে শিখছেন। প্রেম ব্যথার পূজারী। মানুষ প্রেম করে সুখের আশায় কিন্তু সে জানে না সুখ তার মরণ কাঠি, সুখের ঘরে পা বাড়িয়ে তার ঘর ভাঙে। আপনার তথাকথিত প্রেমিক প্রেমিকারা প্রেমের অর্থ বোঝে ?

—তা হ'লে কি বলতে চান এসব ভালবাসার মধ্যে কোন গভীরতাই নেই ?

—গভীরতা নেই তাতো বলছি না আমি। গভীরতা মানেই যে

আলোকের গভীরতা হবে তার কোন মানেই নেই। ওর গভীরতা ভালোবাসায় নয়, ভালো লাগায়—যার জীবনের গভীরতা অতি কম। আমার হাসি পায় যখন শুনি—অমুক ভালোবেসে বিয়ে করেছে, মানেই তো ভালবাসাকে হত্যা করেছে, প্রাণটা খালি ধুক্ধুক্ করছে—শেষ হয়ে এলো বলে।

—কিন্তু আপনার শেষের কথাগুলো বড় স্বার্থপরতার মত শোনাচ্ছে। চপল অতি সোজাভাবেই জিজ্ঞাসা করে—কেন বলুন?

মৃণাল বিস্ময় প্রকাশ করে বলে—কেন কি! ভালোবাসবো, প্রেম করবো—অথচ প্রেমের মর্য্যাদা দেবার সাহস রাখবো না,—প্রেমিকাকে সুখী করবার চেষ্টা করবো না—এ তো কাপুরুষতা বা স্বার্থপরতা।

চপলের মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল—আমাকে আবার ভুল বুঝছেন মিস্টার রায়। আমি প্রেমকে এত সীমাবান্ বা স্বল্পতুষ্ট বলে মানতে চাইছি না। বলেছি তো ভোগের সুখ—গোলাপের জীবন; ব্যথার সুখ হিমালয় অজর, অমর, অটল, অচল। মানুষ যদি ব্যথার পাগল হয় তবে সে প্রেমের মধ্যেও ব্যথা খুঁজবে না কেন বলুন? ওপর থেকে সে যেটা চায় বলে মনে হয় সেটা তার আত্মপ্রবঞ্চনা। প্রেমের মর্য্যাদা বিয়ে করে? নাঃ, আপনি হাসালেন দেখছি। প্রেমের জন্যে কাঁদায় মর্য্যাদা নেই? প্রেমকে অমরত্বের কোঠায় পৌঁছানতে সার্থকতা নেই! বিবাহপদ্ধতিটার উদ্ভব কোন উদ্দেশ্য থেকে জানেন? ভালোবাসাই সুখ; সুখ পাবার জন্যে ভালোবাসাটা অভিনয়। বিয়ের প্রয়োজন বায়ো-

লজিক্যাল্ অর্থাৎ শরীরের প্রয়োজন, আর প্রেমের প্রয়োজন আত্মার কল্যাণে। শরীর যেমন নশ্বর, বিয়ের প্রেমও তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আত্মা অবিনশ্বর তাই রাধা, রাণী মীরা, রামীর প্রেম এখনো অন্ধজনে আলো দেখায়।

মৃণাল একটা সিগারেট অফার করে বল্লে দেখুন, আমরা সাধারণ মানুষ অত মার প্যাঁচ বুঝি না, বুঝতে চাইও না।

চপল ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বলে—তাহলে গালভরে প্রেম কথাটা উচ্চারণ করবেন না। প্রেমকে সহ্য করবার ক্ষমতা যাঁর আছে তাঁর মুখেই ওটা মানায় ভাল। তার চেয়ে বলবেন —ভালো লাগার মধ্য দিয়ে বায়োলজিক্যাল্ জীবন যাপন করতে চাই। রুদ্রের উপাসনা আমরা চাই, কিন্তু রুদ্রকে সহ্য করার ক্ষমতা আছে ক'জনের বলুন? তার চেয়ে নিরীহ গণেশজীকে ফুল গঙ্গাজল যোগানোই ভাল।······এই যে আসুন মিসেস্······

—ভুলে গেছেন তো নামটা? আর বলেছিলাম যে—মিসেস্ টিসেস্ শুনতে আমার ভালো লাগে না। 'অঞ্জলি' নামটা কি এতই খারাপ?- মিসেস্ অঞ্জলি সোম কৃত্রিম রাগ দেখাতে চাইলো।

চপল অপ্রস্তুত হয়ে ওর দিকে একবার চেয়েই শুধরে নিলে কথাটা —অঞ্জলি, নামটা তো বেশ মনেই ছিল, খালি দেখছিলাম আপনি কি বলেন।

অঞ্জলির মুখে হাসি দেখা দিল। মৃণালকে নমস্কার জানিয়ে বলল—বুঝলেন মৃণালবাবু, চপলবাবু জানেন না যে আমি আপনাকে —চিনি আর সেইজন্যেই আপনাদের এই বিরাট আলোচনার খানিকটা

আড়াল থেকে শুনে আড়ালে থাকার ধৈর্য্য ধরতে পারলাম না—যার ফলে এই অতর্কিতে সশরীরে প্রবেশ।

মৃণাল জোর আওয়াজে হেসে উঠলো, চপলও কিছু করবার না পেয়ে সেই সঙ্গে যোগ দিলে। অঞ্জলি ওঁদের হাসির খোরাক যোগাতে পেরেছে বলে নিজেকে খানিকটা ভারী মনে করে বল্ল—আপনাদের তথ্যপূর্ণ সত্যালোচনাগুলি শুনে একটা অতি বাস্তব কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে চপলবাবু। উনি যদি অভয় দেন তো কথা বলেই ফেলি।

চপল অঞ্জলির এই পাকামোতে মনে মনে বিরক্ত হয়েও মুখে বল্ল—কথাটা যখন মনে উঠেছে তখন তাকে মনের বাহির করাই উভয়পক্ষীয় স্বস্তিজনক। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না কথাটা এমন কিইবা হতে পারে যার জন্যে মিসেস্ অঞ্জলি সোমের এতখানি সংকোচ।

অঞ্জলি মুখে কৃত্রিম আলো খেলিয়ে বল্ল—সংকোচ আর কি; অভয় যখন দিলেন তখন বলেই ফেলি। আমার কথা এই যে—আপনি বলেছিলেন বিয়েটা প্রেমের ফাঁসীকাঠ, প্রেম অবিনশ্বর। কিন্তু একটা বাস্তব উদাহরণে এসে জবাব দিনতো আমার কথাটার। ধরুন আপনি ভালোবাসেন একটী মেয়েকে, আপনার ধারণা সেও ভালোবাসে আপনাকে। কিছুদিন ধরে চললো প্রেমের আদান প্রদান—মানে দর্শন অদর্শন, কাছে দেখার সুখ দূরে যাওয়ার দুঃখ, আহার বিহার ইত্যাদি, আচ্ছা, ওগুলো বাদ দিয়ে না হয় ধরুন চললো ভাবের আদর্শের আদান-প্রদান। হাসি-কান্না, পাওয়া না

পাওয়া এবং ভাব-স্রোতের জোয়ার ভাঁটা দিয়ে চললো সে প্রেম-তরী। তারপর কিছুদিন বাদে দেখা গেল আপনি অন্য একটী মেয়েকে বিয়ে করে সস্তা উপন্যাসের প্লট অনুকরণ করে চলেছেন। তখন ? মেয়েটীর প্রেম তখনও বেঁচে থাকবে কি ? না থাকা উচিত ? অন্য-দিক দিয়েই না হয় ধরুন—মেয়েটাই না হয় অন্য পুরুষকে করলো বিয়ে, আর মুখে বল্লে—মন রইল আপনার জন্য তোলা। আপনি তাতে আপনার চলার পথে আলো দেখতে পাবেন তো ?

অঞ্জলির এই প্রশ্নে মৃণাল উল্লসিত হয়ে বললে—এইবার উত্তর দিন চপলবাবু।

চপলের মুখে আবার সেই স্তিমিত হাসি। সিগারেটটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে চপল বল্‌ল—উত্তর দেব বইকি, মৃণালবাবু এবং এর দ্বারা পুনরায় বোঝা যাবে যে, প্রেমকে আমি কত শ্রদ্ধা করি—বক্রদৃষ্টি দেবার বহু তফাতে। অপরের প্রেম দেখে যারা হিংসায় জ্বলে ব্যঙ্গালোচনা করে আমি সেই খেঁকীর দলের নই। প্রত্যেক জিনিষকেই আমি সোজা দৃষ্টিতে দেখবার শিক্ষালাভ করেছি, সে শিক্ষার গুরু আমার মা। সে যাক্, অঞ্জলি দেবীর কথার জবাব আমার দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে দেবার চেষ্টা করি। উনি বলেছেন সস্তা উপন্যাসের সস্তাপ্লটের মত সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্নার কথা। আমি তো বলেছি—প্রেম সুখকে সহ্য করতে পারে না, সেখানে তার মৃত্যু। সুখের পিয়াসী হয়ে অন্যকে বিয়ে করলাম—আর মুখে বল্লাম—মন তোমার জন্য তোলা রইল—একথার কোন অর্থ হয় না। কারণ প্রেম তো আর ব্যবসায় নয় যে, অর্দ্ধেক মাল এক মহাজনকে দিলাম

আর অর্দ্ধেক দিলাম অন্যমহাজনকে সুদে খাটাতে। প্রেম অখণ্ড, বিভাগকে সে সহ্য করতে পারেনা। আর একথাও ঠিক যে—প্রেমিকা সুখে আছে একথা শুনে যে প্রেমিক বলে—তাতেই আমি সুখী সে মিথ্যা কথা বলে। প্রেমিকা প্রেমের জন্য সকল দুঃখকে বরণ করে নিয়েছে, একথা শুনলে প্রেম গর্ব্বে ভরে ওঠে, দীপ্তিময় হয়ে ওঠে তার জীবন, প্রেরণা পায় সে এগিয়ে যাবার, অমর হবার পথে তার অভিযান সুরু হয়। চপল হেসে উঠে বল্‌ল—আমার প্রেমিকা যদি বলে—বাস্তব সুখের জন্য আমি অন্যকে বিয়ে করলাম, কিন্তু মন তোমার জন্য তোলা রইল—তাহলে আমি বলবো—তুমি ঠগী, তুমি সাধারণের চেয়েও নীচে, তোমার দ্বিচারিণী হবার সখ—মানুষের আদিম প্রবৃত্তি, কৃষ্টি, সাধনা, সভ্যতার নামগন্ধ নেই সেখানে। বিয়ে করে ভর্ত্তাকে বল—তোমায় ভাল লাগছে; কিছুদিন বাদে মানুষের আদিম প্রবৃত্তির বশে না হয় তাকে ত্যাগ করে অপরের বাহুলগ্না হয়ে বলো—এখন তোমাকেই চাই—এটা তবু অধিক সম্মানজনক এবং সহজ।

অঞ্জলির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তবু কৃত্রিম হাসবার চেষ্টা করে বল্‌ল—নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি সমাজের বা বাপ মায়ের পীড়নে বাধ্য হয়ে তাকে অপরের কণ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাহলেও অপরকে ভালবাসা কি তার অন্যায়, চপলবাবু?

চপলের মুখে কেমন জানি একটা ব্যথার ছায়া পড়ে; নিম্নকণ্ঠে তাই বলে—সেখানে তো বিভাগ নেই, অঞ্জলি দেবী। সেই কণ্ঠ-লগ্নতার মধ্যে যে সুখের বদলে দুঃখই আছে, তাই শরৎচন্দ্রের 'পার্ব্বতী'কে কেউ অশ্রদ্ধা করতে পারেনি। মানব হৃদয়ে প্রেমই

রাজা, কিন্তু তার মন্ত্রীবর্গও আছে প্রজারাও। তারাও বিদ্রোহ করে বই কি মাঝে মাঝে। কিন্তু এসব আলোচনা আর না এগুনোই ভাল। তার চেয়ে অন্য কথা বলুন।

মৃণালবাবু আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। চপলকে একটা সিগারেট অফার করে কেস্‌টা অঞ্জলি সোমের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

অঞ্জলি মৃণালের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—নো, থ্যাঙ্ক্‌স্‌।

চপল মৃণালের এই আচরণে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মৃণাল চপলকে বলল—চপলবাবু মেয়েদের সিগারেট খাওয়া পছন্দ করেন না?

চপল গম্ভীর হয়ে তার উত্তর দিল আপনিই পছন্দ করবেন কিনা বলুন না—মেয়েরা যদি বুট জুতা পরে কিংবা ছেলেরা ব্যবহার করে হেয়ার পিন?

মৃণালবাবু মূর্খের মত কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে ঝড়ের বেগে ডলি প্রবেশ করলো। অঞ্জলি আবার মৃণালের দিকে বারেক দৃষ্টিপাত করে চপলকে বল্‌ল—চপলবাবু, বড় প্রয়োজন আপনাকে।

চপল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে—আমাকে? কেন বলুন তো?

—এ্যাক্সিডেণ্ট্‌।

—এ্যাক্সিডেণ্ট্‌! কার? কোথায়?—চপল ত্বরিতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়। এ চপলের আগের চপলের সঙ্গে কোন মিল নেই। এ চপলের সঙ্গে দুনিয়ার সকল মানুষের যেন অন্তরঙ্গতা, সকলের ব্যথায় এ যেন পরমাত্মীয়ের মত দরদী।

ডলি নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলে—আপনাকে একটু বাইরে থাম্‌তে

হবে চপলবাবু, বড় প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় বসেই বা একটু পরামর্শ করি!

মৃণাল ও অঞ্জলি আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। মৃণাল হাতজোড় করে বল্‌ল—আপনাকে চিনি না, তবু একদিন পরিচয়-সৌভাগ্য লাভ করবার আশা রাখলুম। আজ যাই, আমরা অনেকক্ষণ এসেছি।

ডলি সোজা গলায় উত্তর দেয়- নতুন করে পরিচয়ের অভিনয় করে কি হবে, মিষ্টার রায়। ক্যাসানোভায় আপনাকে বহুবার দেখেছি। জাষ্টিস্ পিতার এটিকেট্ বজায় রাখতে আমাকে সেখানে বহুবার উপস্থিত হতে হয়েছিল কলের পুতুলের মত।

—ডলি!

ডলি চোখ বুজে ঐ ডাকটা অনুভব করে নিয়ে বল্‌ল—উনি যে যথেষ্ট বড় লোক এবং সেই হিসেবে যে আমি ওঁকে চিনি সেই কথাটাই বলেছি, চপলবাবু।

—চিনবেন বই কি…কি বল্‌লেন…ডলি দেবী। পাঁচ কাজে পাঁচ জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। আমার তো আর জাষ্টিস্ পিতা নেই।

—চপলবাবু, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে বড়—বলে ডলি মৃণালকে উপেক্ষা জানাল।

মৃণাল নমস্কার জানিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালো। অঞ্জলিও ভদ্রতা বজায় রাখতে বিদায় না নিয়ে অন্য উপায় খুঁজে পেল না।

ওরা চলে যাবার পর ডলি পরিত্যক্ত ক্যাম্পচেয়ারটায় গা এলিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো। চপল উৎকণ্ঠিত চোখ

মেলে ডলিকে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি যে বসে পড়লেন মিস্ ডাট্ ! কি এ্যাক্সিডেণ্ট তাত' বললেন না ?

ডলি নিশ্চিন্তভাবে উত্তর দেয়—দাঁড়ান চপলবাবু, বড় হাঁফিয়ে পড়েছি। আপনাদের আলোচনার যতি ভঙ্গ করলাম বলে ক্ষমা করবেন। চপল কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল। ডলি কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ওকে সেই অবস্থায় দেখলে মনে হয় ও যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না মাটীর ওপর। চপল ডলির এই অবস্থা দেখে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে —উঠলেন যে ! আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ঠিক সুস্থ নন। কি হয়েছে বলুন না ?

ডলি মুখে ক্ষীণ হাসি আনবার চেষ্টা করে বল্লে—আমি যাই চপল বাবু। অনর্থক আপনাকে হয় তো বিব্রত করে তুলবো—তখন ক্ষমা করতে পারবেন না। তার চেয়ে যাওয়াই ভাল—বলে ডলি অসংযত চরণে এগুতে চাইল।

চপল মুহূর্ত্তে ডলিকে ধরে বলে—আপনি যে টলছেন, মিস্ ডাট্ ! এ অবস্থায় বাইরে যেতে দিলে মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হবে। কি হয়েছে আপনার ?

—উঃ, বেজায় গা মাথা ঘুরছে চপলবাবু,—ডলি মৃদু কণ্ঠে বলে।

—তা সত্ত্বেও আপনি বাইরে যেতে চাইছেন ? আশ্চর্য্য !—বলে চপল। ডলি ভাল করে ধরবার আগেই ডলি মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো। চপল মুহূর্ত্তকাল বিভ্রান্ত হয়ে মাকে ডাক দিয়ে নিজেই জল আনতে ছুটলো। জল নিয়ে ডলির মাথায় দিয়ে বাতাস করতে করতে মা

এসে পৌছালেন। ডলির জামা কাপড় জলে ভিজে গেল, চুল অবিন্যস্ত হ'য়ে পড়লো, তবু চোখ খুললো না। মা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, ওকে খাটের ওপর তুলে দিতে পারবি, চপল? আমি না হয় ধরছি; তোর দাদাও তো বাড়ী নেই। চপল বলল—তুমি হুকুম করলে আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি, মা। ঐ তো শরীর, পালোয়ান না হলেও আমি পুরুষ মানুষ তো বটে?—এই বলে চপল ডলিকে দুই হাতে তুলে নিয়ে নিজের শয্যায় শুইয়ে দিল।

একটু পরে ডলি চোখ মেলে তাকাল। মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন,—এখন কি সুস্থ বোধ করছ, মা?

ডলি ক্ষীণ হেসে উত্তর দেয়—হ্যাঁ মা, আমি সেরে গেছি এখন।

—মা সহানুভূতির সুরে বল্লেন—এখন কিন্তু উঠ না যেন। খানিক পরে চপল পৌছে দেবে'খন। তোমার বাড়ীতে কি খবর দেব?

না মা, কোন প্রয়োজন নেই। সেখানে কেই বা আছে? বাবা হয়তো বেরিয়ে গেছেন, তিনি তো বাড়ীই থাকেন না। আপনার মত একজন মা যদি থাকতো আমার! মাকে আমার মনেই পড়ে না। শুধু চাকর, বেয়ারা আর বাবুর্চি নিয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে?

মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, আহা! তোমার জন্যে বড় দুঃখ হচ্ছে। তুমি আমার কাছে যখন খুসী এস মা, আমি খুসীই হবো। চপল! ডলিকে এখন যেন ছাড়িস্‌নে, আমি একটু দুধ গরম করে আনি।—বলে মা চলে যান।

চপল নির্ব্বাক হয়ে ডলির শিয়রে বসে থাকে। ওর মন তখন

কোথায় কে তার সন্ধান দেবে। হয় তো সে মন মাতৃহারার দুঃখে পথে পথে কেঁদে ফিরছে। নয় তো সে আকাশের নিবিড় নীলিমার দিকে তাকিয়ে ডাকছে—মা মাগো! কোথায় তুমি? কোন স্বপ্ন রাজ্যে তোমার স্নেহাঙ্ক বিছিয়ে রেখেছ?

ডলি চপলের দিকে খানিকক্ষণ অপলকভাবে চেয়ে থেকে বলে, চপলবাবু!

চপলের ব্যথা ভরা চোখ দুটী ডলির ওপর নিবদ্ধ হয়। ডলির মাথায় হাত দিয়ে চপল মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, এখন কি খানিকটা ভাল লাগছে, ডলি দেবী!

ডলি মৃদু হেসে বলে—এর চেয়ে ভাল আমার সারাজীবনে কখনো লাগেনি, চপলবাবু। আমার বহুদিনের স্বপ্ন আজ সত্য হয়ে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। আমার ইচ্ছা করছে এক সোণার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখি, না না বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখি, যেন না পালায়।

চপল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাশা করে,—এ সব আপনি কি বলছেন, মিস্ ডাট্?

—আমি ঠিকই বলছি চপলবাবু। ভাবছেন মাথা খারাপ হলো নাকি? না গো না, এর চেয়ে ভালো মাথা আমার কোন কালে ছিল না। জীবনে বড় বঞ্চিত আমি। সব পেয়েও আমার কিছুই নেই। বঞ্চনায় সে শূন্য পাত্র আজ কানায় কানায় ভরে উঠেছে। আপনার বাহুর মধ্যে ক্ষণেকের জন্যও আশ্রয় পেয়েছি, আপনি বসে আছেন শিয়রে উৎসুক ব্যথা ভরা চোখ মেলে, এর চেয়ে বড় আশা বড় সার্থকতা আর কি থাকতে পারে বলুন? মেয়ে মানুষ হয়ে আমরা

ফুলের জীবন পেয়েছি চপলবাবু, ভ্রূণ অবস্থা থেকেই বাহুরূপী শাখার অবলম্বনের জন্য কেঁদে মরি। ফুল সে নিজের স্বভাবেই ফোটে। কেউ লাভ করে ধুলার শয়ন, কেউ বা দোলে গলার মালা হয়ে। ধুলার শয়ন যার ভাগ্যলিপি—সে যদি ক্ষণেকের জন্যও মালা হয়ে দুলবার চেষ্টা করে তাহলে তাকে কি দোষ দেবেন বলুন ?

চপল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—তার মানে ?

ডলি প্রগাঢ় কণ্ঠে উত্তর দেয় - কথার মালাকার আপনি। এত কথার মানে জানেন, আর এই সহজ কথাটা বোঝেন না ?···অভিনয়, অভিনয়···ডলি আজ অভিনয় করছে···মিস ডলি ডাটৃ আজ অভিনয়-দক্ষ হয়ে উঠেছে। চোখ বুজে বলে—আমার অভিনয়কে ক্ষমা ক'রো, ভগবান্‌······শুধু প্রার্থনা—এ মুহূর্ত্তগুলিকে অমর করে রেখ। তোমার ওপর আমার রাগ হয়, প্রভু ; তুমি কেন আমায় গরীব করনি ? বড় লোক হবার যে কি জ্বালা তা যদি তুমি জানতে !

চপল বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। এ সব তাহলে অভিনয় ! মনে মনে বলে—কিন্তু তার কি সার্থকতা, ডলি ? অভিনয় দিয়ে কি তুমি আমাকে পথ-ভ্রষ্ট করতে পারবে ? প্রেমকে শ্রদ্ধা করি, হয় তো শুধু কল্পনা বশেই নয় তো শুধু সংস্কার বশেই ; কিন্তু তাকে এখনো অনুভব করতে শিখিনি। আমার সাধনা তাকে কোন দিন অনুভব করতে দেবে কিনা তাও জানি না ; কিংবা সে আসবে অতর্কিতে।

ডলি জিজ্ঞাসা করে—কি ভাবছেন ? কোন্‌টা আমার অভিনয় ? হোঃ হোঃ হোঃ - আপনি বড় সরল মানুষ। আর সেই জন্যই আপনার বিষয় বড় আশঙ্কা হয়। ত্যাগও আপনার দুর্ব্বার, আসক্তিও

আপনার দুর্ব্বার। সে দুর্ব্বারতা আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে!

—আপনার জন্যে আমার দুঃখ হয়, ডলি দেবী। কিন্তু জোর করে কি কুঁড়িকে ফুলে পরিণত করা যায়?

মা প্রবেশ করেন। চপল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়। মা ওকে জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় চল্‌লি, চপল?

চপল সোজা বলে—একটু ঘুরে আসতে, মা।

—মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়ে আয়, বারে!

—তার প্রয়োজন হবে না মাসী মা,—আমি নিজেই যেতে পারবো। ওঁর ওপর অনেক অত্যাচার করেছি, আর নয়।

—তুমি যে দুর্ব্বল, মা!

—না মাসী মা, এখন আর দুর্ব্বলতা নেই। এবার থেকে সত্যি-কার সবল হতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো। আশীর্ব্বাদ করুন—সবল দেহ মন নিয়েই যেন আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারি। সামনের সপ্তাহে আমি বিলেত চলে যাচ্ছি। শুভ কামনা দিন, আমার যাত্রা যেন সার্থক হয়।

মা কিছুই বুঝতে না পেরে দুধের বাটী হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। ডলি তাঁর হাত থেকে বাটীটা নিয়ে কোন রকমে দুধটা গিলে ফেলে আবার পাশ ফিরে শোয়।

নবম পর্য্যায়

মেঘ্‌লা সকাল তখন প্রায় দুপুরের দিকে গড়াতে চলেছে। আকাশের কেমন জানি একটা বিষাদের ভাব। কলিকাতা সহরের চিরচঞ্চল প্রাণে তার ছায়া মাত্র পড়েনি—ও যেন চিরযৌবনা।

চপল উদ্দেশ্য-বিহীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। খানিক আগের এ্যাক্সিডেণ্ট, হ্যাঁ এ্যাক্সিডেণ্টই বটে, চপলের মনে খানিক ছায়াপাত করেছিল বটে, কিন্তু আকাশের ওই পাণ্ডুরতা তার ছায়া-টুকু নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে সুর মিশে গেছে তারি ঝঙ্কারে যেন ভেসে আসে ওর কানে, পথে পথে ঘুরে ও যেন সে সুরকে গভীরতর করতে চায়।

হাঁটতে হাঁটতে ও কখন এই পাড়াটার ভিতর এসে পড়েছে ওর নিজেরই খেয়াল ছিল না। চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনার স্তূপ, দুর্গন্ধময় আবহাওয়া, আলোবাতাসহীন জীর্ণ কুটীরগুলি শোষণের চরম নিদর্শন রূপে দাঁড়িয়ে আছে। চপল দরদী মন নিয়ে সেগুলি দেখে বেড়ায়। রাস্তার দুটী উলঙ্গ শিশু একটা সামান্য জিনিষ নিয়ে উলঙ্গ অশ্লীলতার অভিনয় করে চলে। চপল তাদের কাছে এসে দুজনকে দুটো পয়সা এগিয়ে দেয়। ছেলে দুটী ছোঁ মেরে পয়সা দুটী নিয়ে বারেক ওর মুখের দিকে চেয়ে আবার পূর্ব্ব অভিনয় সুরু করে। চপল দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে চলে। রাস্তার আবর্জ্জনার মধ্যে ততোধিক

আবর্জ্জনাপূর্ণ ছিন্ন কাঁথা পেতে ওখানে এক কুলি হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে সারা হচ্ছে। চপল ও দৃশ্য সহ্য করতে পারেনা। পাশে শূন্য তাড়ির ভাঁড় পড়ে আছে। রাজ্যের মাছি এসে সেখানে মেলা বসিয়েছে। ওরই পাশে বসে কয়েকটী শিশু আহারে প্রবৃত্ত হয়েছে। চপলের ইচ্ছা করে ওদের গালে চড় বসিয়ে ভাতের থালাটা কেড়ে নিয়ে ওই ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেয়। সমস্ত বস্তিটা জীবন্ত নরক বলে ওর মনে হয়। চপল এগিয়ে চলে।

বস্তির রাস্তাটা এসে বড় রাস্তায় মিশে গেছে। ওই কিছু দূর দিয়েই ট্রাম-বাসের চলাচল। ওখানে পয়সার জুয়াখেলা চলেছে, তার বিরাম নেই, সময় নেই, অসময় নেই। নির্ম্মম কঠিন অহঙ্কার বিসর্পিল দেহ বিস্তার করে ওখানে রাজত্ব করে। চপল এগিয়ে চলে।

সামনে একটা রেষ্টুরেণ্ট্ দেখে ও ঢুকে পড়ে। সামনে একটা মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে ক্রীম রঙের। এখানে ঢুকতে বারেকের জন্য সংকোচ হলেও চপল ঢুকে পড়ে। বিলাতী কায়দাকে নকল করে চেয়ার টেবিলগুলো সাজানো। ওরই একটায় বসে প'ড়ে এক কাপ চা আর টোষ্টের অর্ডার দেয়।

চা আর টোষ্ট্ এসে হাজির হল—বিলাতী তৎপরতায়। একটু দূরেই ওই টেবিলটায় বসে দুটী লোফার গোছের লোক যেন ক্যারিকেচার সুরু করেছে। এই রো'গুলির ওপারে প্রাইভেট্ চেম্বার—ভদ্রমণ্ডলীর জন্য বোধ হয়।

চপল চায়ের কাপে সিপ্ দিয়ে পকেটে হাত দেয় সিগারেটের প্যাকেট বার করবার জন্য। চায়ের সঙ্গে সিগারেট না ধরালে চা

খাওয়ার কোন মানে হয় না—এই ওর ধারণা। পকেটে হাত দিয়ে ও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাইতো, প্যাকেটটা গেল কোথায়! এ-পকেট সে-পকেট হাতড়েও তার কোন সন্ধানই মেলে না। চপলের মনে উৎ-কণ্ঠা এসে চেপে বসে। সর্ব্বনাশ, মনিব্যাগ? কি করবে ভেবে না পেয়ে ও ঘাড় হেঁট করে বসে। মুহূর্ত্ত পরেই যে অপমান ওর ভাগ্যে উদ্যত হয়ে আছে তার কথা ভেবে ওর কান্না পায়। একবার ভাবে—সোজা গিয়ে সত্য কথা বলে। কিন্তু এখানে সত্যের দাম কি! ও ভিতরে ভিতরে শিউরে ওঠে। হাসবে না কাঁদবে, লুকিয়ে পালাবে, না ওদের উদ্ধত অপমানের কাছে আত্ম-সমর্পন করবে, কিছুই ঠিক করতে পারে না।

—হ্যালো চপলবাবু, আপনি এখানে যে?

চপল চোখ তুলে দেখে মৃণাল। ওর মনে হয় মৃণাল বুঝি ওর দুরবস্থার কথা বুঝতে পেরেছে। তবু মুখে মৃদু হাসি টেনে চপল বলে—একটা কাজে বেরিয়েছিলাম।

মৃণাল চেয়ার টেনে চপলের সামনেই বসে। মৃণালের আহ্বানে বয় এসে হাজির হয়—নির্ব্বাক তালপাতার সেপাই। কোল্ড্‌ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে জাঁকিয়ে বসে। চপল ভাবে মৃণাল বুঝি নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর অপমান দেখবার উল্লাসে মেতে উঠেছে।

চপলের চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তবুও সে নির্ব্বাক হয়ে বসে থাকে। মৃণালের কোল্ড্‌ড্রিঙ্ক এসে পড়ে। মৃণাল তাতে একটা সিপ্‌ দিয়ে বলে—বাঃ, বসে রইলেন যে। আর কিছু নিন। বয়!……ও, চা তো আপনার জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। এই দুসরা চা লে আও,

আউর কাট্‌লেট্‌। চপল বাধা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু ধনিকের ঔদ্ধত্যের আবদারের কাছে পরাজিত হয়।

চা আর কাট্‌লেট্‌ এসে যায়। চপলের হাত উঠতে চায় না, তবু কোন রকমে ওকে সেগুলি উদরস্থ করতেই হয়—যতক্ষণ ভদ্রতাকে বজায় রাখা যায় এই ওর মানসিক ভাব। মৃণালের মুখ থেকে মৃদু বিজাতীয় গন্ধ ভেসে আসে—ভাল করে লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না।

—কোথায় গিয়েছিলেন এবারে? ডলিদেবীর বাড়ী বোধহয়? চপল নিরুৎসাহ নিয়েই উত্তর দেয়—না।

—আচ্ছা, উনি তখন ওরকম ব্যবহার করলেন কেন বুঝতে পারলাম না।

— উনি হয়তো প্রকৃতিস্থ ছিলেন না।

— আপনার কেউ হন কি?

—না—সোজা ছোট্ট উত্তর আসে।

—ও, তবে আপনার সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা আছে বোঝা যায়। আনন্দের কথা অবশ্য। আপনার মত প্রতিভার অন্তরঙ্গতা লাভ করা সে কি কম সৌভাগ্যের কথা? আর সোনায় সোহাগা মিলেছে — উনিও জাষ্টিস্‌ কন্যা।

চপল অনাসক্ত ভাবে জবাব দেয়—আপনার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ধারণা খানিকটা আপনার ভুল। অন্তরঙ্গতার চেষ্টা আছে এক পক্ষ থেকে বল্লে— সত্যের অধিক নিকটে পৌছান হবে।

মৃণাল অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে—শুধু আপনার অমর্য্যাদা

করা হবে এই ভেবে ওর কথার যথাযথ উত্তরটা তখন দিইনি। তা নইলে ওকে বুঝিয়ে, দিতে পারতাম হয়তো যে, ওরকম বহু সিভিলিয়ানী রত্নকে জানবার সুযোগ আমার হয়েছে।

চপল দ্বিধাশূন্যভাবে বলে—তা আন্দাজ করতে পারি, মিষ্টার রায়। ওঁর কথায় উত্তর দিতে গেলে অযথার্থতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হতো। বল্লাম তো উনি হয়তো প্রকৃতস্থ ছিলেন না তখন। আমার উত্তরটা পরিচিত জনের কদর বাড়ানো বলে মনে করলে ভুল করবেন।

মৃণাল আবার হেসে উঠলো। কথার মোড় ফিরিয়ে বল্‌ল—সে থাক্। কাল আমাদের উৎসব আপনার কেমন লাগলো? ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বুঝলেন তো?

—ওটা আপনার বিনয় তা বুঝতে পারি। আপনাদের উৎসবে গিয়ে বেশ আনন্দই পেলাম, এটা কিন্তু সত্যিই।

—মীরাদেবীর গান কেমন লাগলো আপনার—ভজন গান আর আপনার শিখা? 'শিখা'কে উনি নিজেই নৃত্যরূপ দিয়েছেন—যা দেখালো ওই ছোট মেয়েটা। সব দিকেই মীরাদেবীর বেশ প্রতিভা আছে, নয় কি?

চপল নিরবলম্ব কণ্ঠে উত্তর দেয়—হতে পারে।

—আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো কি? আমি নিজে অন্যকাজে বড় ব্যস্ত ছিলাম, তাই পরিচয় করিয়ে দিতে পারিনি।

খানিকটা হলো বই কি! চপল বলল।

—বেশ মেয়ে নয়?

মৃণাল হেসে বলল—কি মনে হয় আপনার?

চপল মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌লে—আমার আর কি মনে হবে বলুন। কতটুকুই বা পরিচয়! ভাল যদি নাই হয় তাহলে খারাপ হবে।

মৃণাল মিলিয়ে যাওয়া হাসির রেখায় টান মেরে বললে—খারাপ হবেই? কেন এও তো হতে পারে যে ভালও হলো না খুব অথচ মন্দও নয়; তার মানে আর কি মাঝামাঝি—যাকে বলে সাধারণ।

অর্থাৎ বোধ্য এইতো বলছেন?—চপল জিজ্ঞাসা করে।—আপনার কথাই ঠিক, আমার বলাটা ভুলই বটে। আগা আর গোড়া নিয়েই আগাগোড়া নয়, মাঝখানটাও আছে। সেটা আমার ভুল যেমন ভুল করেন আমাদের দেশের স্বয়ম্ভু নেতারা। পিকেটীং কর, জেলে যাও, প্রাণ বলি দাও আর নইলে এ রাস্তা থেকে বিদায় নিয়ে সুখে ঘরকন্না লাগাও, দেশের নাম মুখেও এনো না, বিশ্বাসঘাতক নাম নিয়ে দরজায় খিল দাও। এই দুই প্রান্তের মধ্যে যে আরো একটা কিছু আছে, যেটাকে অবলম্বন করে প্রান্তদুটাই টিকে আছে, সে খেয়াল এঁদের নেই। মাঝকে বাদ দিলে যে আগাও টিকে থাকতে পারে না, গোড়াও হয় প্রাণহীন, সে কথা এঁরা ভুলে যান। হ্যাঁ কি বলছিলেন মীরা দেবীর কথা? চপল একটু থম্‌কে যায়, ভাবে—কি দরকার মেয়ে সংশ্লিষ্ট আলোচনাকে খুঁচিয়ে তোলার? কিন্তু কি যেন ওকে ঠেলা দিতে থাকে ভিতর থেকে ও তাই বলে—কি করে বুঝবো বলুন সামান্য পরিচয়ে? সে কথা বরং আপনিই ভাল বলতে পারেন।

তার মানে চপলের বর্ত্তমানের অসাবধানী মন মীরার কথা খানিকটা শুনতে চায়—ঔৎসুক্য ভিতর থেকে উঁকি মারছে। ওর দুর্ব্বার মন খানিক সময়ের জন্য যেন ওকে ছুটী দিয়েছে।

মৃণাল বলে—তাতো ঠিকই। একদিনেই কি আর মানুষের সবখানি জানা যায়? আপনার সাথে পরিচিত হবার সখ ওঁর অনেক দিন থেকেই। আপনার লেখার উনি একজন নির্ম্মম ভক্ত। উনি বলেন—আপনার লেখার ধারা যেমন সাধারণ থেকে আলাদা; মানুষটাও নিশ্চয়ই তাই।

চপল হেসে ওঠে বলে—প্রথমতঃ 'নির্ম্মমভক্ত' কথাটা আমার কাছে নির্ম্মমই ঠেকছে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ হিসেবেও যে আমি সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র, এ ধারণা ওঁর কি করে হলো?

মৃণাল সিগারেট ধরিয়ে বল্‌লে—আপনার লেখার কেউ বক্র সমালোচনা করলে উনি তার ওপর নির্ম্মমই হয়ে ওঠেন। আর মানুষটার ধারণা হয়তো······স্বপ্নেই করে থাকবেন—বলে মৃণাল হেসে উঠলো আপনার ওপর আমার হিংসা হয় চপলবাবু। সেই হিংসার বশে কোনদিন দু'লাইন লিখবারও কোসিস করেছি, কিন্তু ও বাবা······সে লেখা ওঁর হাতে পড়লে উনি কোনদিন আর ব্যাঙের-ছাতা-মার্কা কবি মৃণাল রায়ের মুখ দর্শন করতেন না।······কিন্তু বেলা অনেক হয়েছে, চলুন যাওয়া যাক্—বলে মৃণাল উঠে দাঁড়াল।

চপলের মুখ আবার মুহূর্ত্তেই কালো হয়ে গেল পকেটে হাত দিয়ে। কিন্তু চপলের সৌভাগ্য সেবার ওকে খুব বাঁচাল। মৃণাল বিল চুকিয়ে দিল সবটাই—ভদ্রতার অভিনয় করে চপল সে যাত্রা রক্ষা পেল, কিন্তু মনে খোঁচা বিঁধে রইল। নিজের অন্যমনস্ক মনকে ও কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলো না।

মৃণাল ওকে পৌঁছে দেবার অনুরোধ করা সত্বেও চপল নমস্কার

জানিয়ে করুণার বোঝা বাড়াতে স্বীকার না করে জন-কোলাহল মুখরিত ফুটপাথ ধরেই এগিয়ে চল্‌লো। ট্রামে বাসে না গিয়ে হেঁটে যাওয়ার নির্য্যাতন ও স্বেচ্ছায় বরণ করে নিল প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

মৃণালের মোট তখন অন্তর্বাষ্পের প্ররোচনায় কতদূর গিয়ে পড়েছে কে জানে।

* * * *

বাড়ী ফিরে চপল সোজা টেবিলে এসে বসে পড়লো। বইখানা মুড়ে গেছে, আর তারই ওপর চায়ের কাপ বসানো। নিজেই কখন বসিয়ে রেখেছে খেয়াল নেই। কাপটাকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে ও বইটাকে তুলে নিল মুছবার জন্যে। আহা, কি বিশ্রীই হয়ে গেছে মলাটটা। বইটাকে আদর করে বলে—লক্ষ্মী সোনা রাগ করোনা। তোমার গায়ে অজান্তে কলঙ্কের ছাপ লাগিয়ে দিয়েছি—সে শুধু বাইরের। তোমার অন্তরের সম্পদকে কেউ কোনকালে ম্রিয়মান করতে পারবে না, হাজার চেষ্টা করলেও না। সেখানে তুমি চির দীপ্তিময়।······বইটাকে নামিয়ে রেখে ও কাগজ পত্রগুলো ঠিক করে গুচিয়ে রাখতে লাগলো। হঠাৎ ওর চোখ পড়লো একটুক্‌রো কাগজের ওপর। কাল রাত্রে বাড়ী ফিরে কখন এই কাগজটার ওপর এই রেখাগুলো টেনে গেছে ওর নিজেরই মনে আসছে না। কি আশ্চর্য্য! চপল লিখে গেছে মীরা সেনের নাম বারবার! নাঃ সত্যিই ওকে ভূতে পেয়েছিল কাল। সারা কাগজটায় লিখে গেছে মাত্র ওই কটা অক্ষর! এ কি করে সম্ভব হলো?···হঠাৎ ওর মুখ-খানা শুকিয়ে গেল। তাহলে মৃণালবাবুও তো দেখেছেন এই কীর্ত্তি।

এঃ কি ভাবলে দেখতো। মহামুস্কিলেই ওকে ফেলেছে ওই সামান্য একটা মেয়ে—মীরা না কি ছাই নাম। কেনই বা গেল ও মেয়েটাকে প্রশ্রয় দিতে? কি নাছোড়বান্দা মেয়ে রে বাবা। সামান্য দুচারটে কথার জবাব দিয়ে পার পাবার উপায় আছে? অনেক চেষ্টাই তো ও করেছিল এড়াবার জন্য, কিন্তু ওই ঘোড়দৌড়ের মেয়ের সঙ্গে কে পারবে বল? যেন পাজা কোলে করে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলে। হুঁ আবার ঠিকানা লিখে দেওয়া—চপল ব্র্যাকেটে টাঙানো জামার পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটা বের করে নিয়ে এল। কিন্তু মৃণাল-বাবুর কাছে এই যে অসম্মান ওর হলো তাকে ও ফেরাবে কি করে? বইপত্র উল্টেপাল্টে দেখছেন উনি, বেয়াকুফের মত ও সেই সময়টা গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়, নিশ্চয়ই এটাও চোখে পড়েছে। তাই কি উনি ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মীরা দেবীকে আপনার কি রকম লাগে?—ছাই লাগে। কত মেয়েকে ও স্বেচ্ছায় বিদায় দিলে, ডলি দত্তের মত মেয়েকে পর্য্যন্ত, আর সামান্য কোথাকার কে মীরা সেন।

চপল শক্ত হয়ে বসে। কাগজ দুটো চোখের সামনে মেলে ধরে খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে নিশ্চয়ই ডলি, প্রীতি অঞ্জলি ইত্যাদির মত মীরা সেনকেও ও উপেক্ষা দেখিয়ে দেবে—কঠিনতর উপেক্ষা, নির্ম্মমতম অবহেলা। কিন্তু উপেক্ষা দেখাতে হলে অপরপক্ষ থেকে অপেক্ষার প্রয়োজন। মীরা যদি কোন অপেক্ষাই না করে, যদি না দেখায় অন্তরঙ্গতা-কামনার দুর্ব্বলতা? তাহলে? উপেক্ষা কাকে দেখাবে? চপলের মনে ধাক্কা লাগে। নাঃ ওর মাথাটা আবার গুলিয়ে যাচ্ছে।

চপল কবিতার কাগজটাও টেনে বার করে। এটা ও কি দেখছেন মৃণালবাবু?

—তাইতো, সামা ন্য একটা কাগজের টুকরো যে এত বিপত্তি বাধাতে পারে এ ধারণা চপলের ছিল না। ও ঘেমে ওঠে। নিজের মনকে ও নানা রকমে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করে, ভাবে—হয়তো দেখেননি। ভালো কথা, উনি যে আলমারীর বই দেখছিলেন। টেবিলের কাগজপত্র কি কোন ভদ্রলোক নেড়ে চেড়ে দেখেন? হাজার হোক ভদ্রলোকতো। মীরা চেয়েছিল আলাপ করতে, নিজে পরিচয় করিয়ে দেবার অবসর পাননি, তাই হয়তো সাধারণ ভাবেই মীরার প্রসঙ্গ উঠানো। আর মৃণালবাবুর তো মীরা সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা আছে মনে হলো। পক্ষান্তরে যাচাই করে নিলেন আপন ভালোবাসার নিধির কদর। লোকটা কিন্তু ভাল বলে মনে হয় না, আবার মদও খায়, রাবিশ্।

চপল খানিকটা আশ্বস্ত হয়। টেবিল থেকে কাগজের খণ্ড তিনটী নিয়ে শতটুকরো করে জানালা দিয়ে ফেলে দেয়। মীরার নিজ হাতে লিখে দেওয়া ঠিকানার কাগজটী মর্য্যাদা হারিয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আবর্জ্জনার স্তুপেই আশ্রয়লাভ করে বা।

ব্রতী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

দশম পর্য্যায়

মীরা সেনের বাবা যামিনীমোহন ছিলেন সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে একজন নাম করা ব্যক্তি। বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, আর তারই বলে উন্নতি লাভ করতে করতে এমন এক পদে এসে স্থিতিলাভ করলেন, যার দায়িত্ব ও মর্য্যাদা তাঁকে পূর্ব্বের অবস্থা ভুলিয়ে দিল। আত্মস্থ মানুষ অথচ আত্মসঞ্চয়ে বিশেষ মন দিলেন না—মানুষ মরণশীল এ সত্যটা হয়তো তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সরকারের নির্দ্দেশে তাঁকে সারা দেশময় ঘুরে বেড়াতে হতো, আর সেই সুযোগে বিস্তর পয়সাও তাঁর পকেটে ঘুরে ঘুরে হাজির হতো।

এই বিভাগেরই এক কাজের ভার নিয়ে যখন তিনি একবার এগিয়ে চলেছেন পশ্চিম ভারতের দেশে দেশে, তখন বাড়ী থেকে সংবাদ পেলেন যে, তাঁর সংসারে আর একজন নতুন অতিথির আগমন হয়েছে। তিন পুত্রের পর কন্যারত্ন লাভ করে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কম নয়। শারীরিক অসুস্থতার নজীর দেখিয়ে সুদূর পাঞ্জাব থেকে তিনি ফিরে এলেন বাঙ্‌লা দেশে—তাঁর নিজের আনন্দ নীড়ে। বন্ধুদের ডেকে এক প্রীতিভোজ দিলেন—কন্যার জন্ম উপলক্ষ্য করে। মনে মনে তাঁর কত কল্পনাই না জাগলো—মেয়েকে গড়ে তুলবার আদর্শ নিয়ে।

মেয়ে যখন মাত্র একবৎসরের গণ্ডী অতিক্রম করলো তখন থেকেই উনি মনে করলেন—মেয়ের আমার বয়স হচ্ছে—অর্থাৎ শিক্ষার বুদ্ধি

পাকছে। এক বৎসরের মেয়ের জন্য তিনি কিনতে লাগলেন নানা ছবির বই—যেগুলি প্রতিসপ্তাহে গড়ে তিনখানা করে ও ছিঁড়তে আরম্ভ করলো। মেয়ের কোল-পিয়াসী বাহুর বাঁধন এড়ালেন একগাদা ইংরাজী বই কিনে দিয়ে এবং ওঁর বুদ্ধি সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে বললেন—ওগুলো তোলা থাকবে, মীরা বড় হলে ওর যেন খোরাকের অভাব না হয়। কার্য্যব্যপদেশে বিদেশে গিয়েও তিনি মেয়ের কথা ভুললেন না। সেখান থেকেও তাই নিয়মিত আসতে থাকলো বই-এর পার্শ্বেল। মীরার জন্য একটা আলাদা ঘর উনি এখন থেকে ঠিক করে গেলেন, যাবার সময় কণ্ট্রাক্টর ডেকে বলে গেলেন ঘরখানাতে কি ভাবে কি বন্দোবস্ত করতে হবে—আলমারী র‍্যাক ইত্যাদি দিয়ে। সেখানে এখন থেকেই বোঝাই হতে লাগলো দেশ বিদেশের ছোটদের বই। কি জানি জীবনের কথা বলা যায় না, তাই কিছুদিন বাদে বড়দের বইও জমা হতে লাগলো। ওঁর খেয়ালের বিরুদ্ধে কারুর কিছু বলবার উপায় ছিল না। মীরার মা যদি মোটা মোটা বইগুলিকে দেখে কিছু না বলেও অবাক্ হবার ভাব দেখাতেন তাহলে উনি পরম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করে বলতেন—আমার বুদ্ধি তোমার চেয়ে ঢের বেশী, বুঝলে? যাও যাও মীরাকে নিয়ে এস দেখি, এখন থেকেই বইগুলোর ভিতর খেলা করার অভ্যাস করুক। উনি সর্ব্বদাই ভাবতেন উনি না থাকলে মীরার মনের খোরাক যোগাবে কে; একবারও ভেবে দেখেননি—মীরা না থাকলে ওঁর মনকে প্রবোধ দেবেন কি দিয়ে? এসব বই, এত আয়োজন—রাম না হতেই রামায়ণের সৃষ্টি, এসব কি হবে!

ওর ভাইগুলো মীরার প্রতি পিতাঠাকুরের এই অহেতুক পক্ষপাতিত্ব দেখে অবাক হয়ে পড়লো। ওরা এও ঠিক করতে পারলো না যে, এত বই মীরার মত একরত্তি মেয়ে কি করবে। ওকে কি বই-এর পোকা বানাবার ইচ্ছা বাবার—যেগুলিকে ও দুখানা দাঁত দিয়ে ছিঁড়বার চেষ্টা মাত্র করতে পারে। সকলের ছোট হলেও বাড়ীর সকলের ওপরই ও তাই চালাতে লাগলো আপন খেয়াল খুসীর কর্ত্তৃত্ব।

ওর বয়স যখন ছয় কি সাত, তখন ওর বাবা একবার বিদেশ থেকে ফিরে এলেন অসুস্থ শরীর নিয়ে। ডাক্তার বদ্যির আড়ম্বর যথেষ্ট চললেও গোড়া-আলগা গাছের মত ওর শরীর ক্রমশঃ নীচু দিকেই নামতে আরম্ভ করলো। সরকারের কাছে ছুটীর মেয়াদ বাড়াবার দরখাস্ত করে উনি রওনা হলেন পশ্চিমের এক স্বাস্থ্যকর জায়গায় স্বাস্থ্যোন্নতির আশা বুকে ধরে। সেখানে বাড়ীভাড়া করে অস্থায়ীভাবে পাতলেন নিজের সংসার মীরাকে নিয়ে, সঙ্গে রইলেন মাত্র মীরার মা। কিন্তু ফুটো-করা বেলুনের মত তাঁর শরীরের মর্য্যাদা কমে আসতেই লাগলো—কার্য্যকারিতাও। বিদেশের বাসা উঠিয়ে তিনি আবার নিজের বাড়ীতেই ফিরে এলেন। সেখানে কিছুদিন বাদেই তিনি মীরার মায়া কাটাতে বাধ্য হলেন—সংসারের সকল ভার বড়ছেলেটীর স্কন্ধে চাপিয়ে। মীরার বয়স তখন মাত্র ন'বৎসর। ওর বড় দাদা কল্যাণ আদালতের কাগজপত্রের সাথে মীরার তত্ত্বাবধানের ভার তুলে নিলেন নিজ হাতে।

এমনিভাবে কেটে গেল কয়েক বৎসর—অকিঞ্চিৎকর যার ইতিহাস।

ম্যাট্রিক দেবার পর মীরা কলেজে পদার্পণ করে বাবার রেখে যাওয়া লাইব্রেরী আশ্রয় করলো। কল্যাণও বাবার ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটী করলেন না। ওকালতীতে পসার জমিয়ে কল্যাণ তাই বাড়িয়ে চল্লেন ওর লাইব্রেরীর আয়তন।

কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাশ করার পর ওর দাদা ওকে আরো এগুতে বল্লেন। মীরা কিন্তু বেঁকে বসলো এই বলে—বেশী কলেজী বিদ্যে আয়ত্ত করে কিইবা হ'বে দাদা। তোমার মীরা বহিন্ কলেজী তোতা-পণ্ডিতদেরও কিছু শেখাবার স্পর্দ্ধা রাখে। বাবার অর্থ দিয়ে কেনা এত বই-এর মর্য্যাদা আমি নষ্ট করিনি, দাদা। তুমি ভেব না, একটা জীবন আমি এই দিয়েই চালিয়ে নিতে পারবো।

কল্যাণ আপত্তি জানালেন, কিন্তু কাজের হলো না। ইউনি-ভারসিটীকে সেলাম জানিয়ে মীরা তাই আবার লাইব্রেরী আশ্রয় করলো—যার সূত্র ওকে ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। এত বই পড়েও মীরার চঞ্চলতা কিন্তু ঘুচলো না।

সংসারে মাত্র তিনজন—মীরা, মীরার মা আর দাদা। সংসারের সকল স্নেহ ওকে আশ্রয় করেই বেঁচেই রইল। ওর বড়দা বিয়ে না করে ভালবাসলেন বোনটীকে—যাকে তিনি ভরিয়ে তুলতে চাইলেন সব দিক দিয়েই নিজের সন্তানের মত।

একদিন ওকে কাছে ডেকে বল্লেন—মানুষের জীবন মরণের কথা বলা যায় না মীরা। তোর মেজদার মত আমিও হয়তো একদিন

সাড়া দিয়ে বসবো পরপারের ডাকে। বড় হয়েছিস্ তুই, লেখাপড়াও শিখেছিস্ তাও সাধারণ নয় জানি, কিন্তু তবু তুই মেয়েমানুষ। বাস্তব জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পাবি পদে পদে বাধা। তাই ইচ্ছা করেছি পথে চলবার পাথেয় যাতে তোর কোনদিক দিয়েই অভাব না হয় তার ব্যবস্থা করে যাবো।

—তুমি কি বলতে চাইছো, দাদা? মীরা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

—আমি এই বলতে চাইছি না, যে আমি তোকে সাধারণ সংসারী করে দিতে চাই। নিজেকে বুঝবার এবং বুঝে পা বাড়াবার মত বয়স ও শিক্ষা তুই দুটোই লাভ করেছিস্। তোর স্বাধীন উচ্ছল মনে শিকল পরাবার ব্যবস্থা করে তাকে বিড়ম্বিত করবার চেষ্টা কোনকালেই করবো না। নিজের মনোমত পথে পা বাড়িয়েও যে তুই নিজের সম্মানকে বজায় রাখতে পারবি সে বিশ্বাস আমার আছে।

মীরা উৎসুক নেত্রে ওর দাদার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আমি তোকে যা বলতে চাইছিলাম সেটা এই যে—বাবা তোর সমস্ত ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন। তাঁর শেষের কথাগুলি আজো আমার কাণে বাজে।

মীরার চোখ সজল হয়ে আসতে চায়। পাত্‌লাভাবে মনে পড়ে বাবার প্রশান্ত মুখখানা।

—শোন্ মীরা—কর্ত্তব্যকর্ম্মে পাছে ভুল থেকে যায় তাই সদাই জাগে ভয়। বাবা মারা যাবার সময় বিশেষ কিছুই দিয়ে যেতে পারেন নি আমাদের এক শিক্ষা ছাড়া। ভিতরে ভিতরে তিনি চালিয়ে এসেছেন অনেক দুস্থ সংসার—যাদের ছেলেদেরই উনি নিজের ক্যারাক্ট-

রালে প্রেরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওঁর উপার্জ্জনের মূল থেকে রস সংগ্রহ করে মাথা খাড়া করে উঠেছে। সে কথা আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি ; আর তার ফলেই তাঁকে খাটতে হয়েছে অমানুষিক, উন্নতির আশায়, যার ফলে তাঁর দেহ বেশীদিন টিকলো না। তবু আমাদের তিনি একেবারে রাস্তায় বসিয়ে যাননি। যা কিছু তিনি অজান্তেই ফেলে গেছেন তাতে হিসাব করে চল্‌লে একটা সংসার খুব চলে যেতে পারে।......আমি তো নিজের পায়েই দাঁড়াতে শিখেছি তাঁর আশীর্ব্বাদে। আমি যা রোজগার করি তাতে মাকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে যেতে পারবো। তোর ছোটদার কথা ছেড়েই দে—সাহেব মানুষ সে, কি করছে না করছে, কেমন আছে না আছে তার খোঁজটা পর্য্যন্ত দেয় না। বাবার ফেলে যাওয়া বিত্ত, যা এতদিন আমার নামেই ব্যাঙ্কে জমা রয়েছে ; সেটা বদলে তাই তোর নামে করে দিতে চাই। এই হচ্ছে আমার বলবার কথা। মানুষের জীবন বা মন পেণ্ডুলামের মত দোল খাচ্ছে—কোন স্থিরতাই তার নেই তাতো বুঝিস্, মীরা !

মীরার মুখ হতে খানিকক্ষণ কোন কথাই বেরয় না। স্তব্ধ আঁখি মেলে খানিকক্ষণ দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে– তার মানে তুমি চাও আমায় পর করে দিতে ?

—ভুল বুঝিস্ না, মীরা। আমি যে তা চাইছি না সে তুই ঠিক জানিস্। আমি চাই তোকে আরো আপন করে নিতে।

—এই বুঝি তোমার আপন করে নেওয়া ?—ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

কল্যাণ ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেন—কাঁদবার মত এ থেকে কি পেলি, মীরা? লেখাপড়া শিখলেও তোর বুদ্ধি এখনো পাতলা। তাই ঠিক বুঝতে পারবি না—কেন আমি এই ব্যবস্থাই করতে চাই। পাথেয় না থাকলে পথ চলা ভার হয়ে ওঠে তাতো জানিস্—জীবনের পথ যখন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তোর মর্য্যাদা আমি বাড়িয়েই দিতে চাই ওই আলোকপ্রাপ্ত মনের পিছনে বাস্তবশক্তির যোগান দিয়ে। আমার কাছে তুই আসবি মাথা উঁচু করেই—স্নেহের ডালি বহন করে, মাথা নীচু করে আশ্রিতার মত নয়।

—ও সব আমি বুঝতে চাই না, দাদা—ও বলে—হয়তো চেষ্টা করলেও বুঝতে পারবো না। বাবার সঞ্চিত বিত্তটুকু যা তুমি আমার স্কন্ধে চাপাবার ব্যবস্থা করতে চাইছো, তা মার ইচ্ছার সার্থকতায় ব্যয়িত হলেই বেশী খুশী হবো, অথবা বাবার স্ফুর্ত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে তো পারো। আমার স্নেহের সম্বন্ধ যেন কোনকালে ক্ষুণ্ণ না হয় এইতো বলতে চাও তুমি? আর সেইজন্য আমিও সঙ্কল্প করেছি—তোমার ও বাবার দেওয়া ওই শক্তি আমার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কাজে ব্যয়িত হতে দেব না। অপরিমেয়ই তোমরা আমাকে দিয়েছ, তারই ভারে চিরটীকাল আমার মাথা তোমাদের পায়ে নত হয়ে থাকবে। আরো বোঝা চাপিয়ে তুমি তাকে একেবারে মাটীতে মিশিয়ে দিতে চেও না। আমি তো কোনকালেই আমার ব্যবহারে বৈলক্ষণ্য দেখাই নি, দাদা! তবে কেন তুমি চাইছো আমাকে পর করে দিতে?

—এর মানে পর করে দেওয়া!

—তা নয়তো কি?—ও জোর দিয়ে বলে,—অনর্থক অর্থের বোঝা

তুমি কেন আমাদের মধ্যে খাড়া করে রাখতে চাও? আমি যে সে খোঁচা সহ্য করতে পারবো না—সে কথা তুমি একবারো ভাবলে না। তুমি তো নিজেই বল্লে—মাথা নীচু করে যাতে আসতে না হয়। তাই আমিও ঠিক করেছি নিজের পায়েই দাঁড়াবো। বাবার মেয়ে আমি, তোমার বোন, তোমাদের আশীর্ব্বাদ আমার ওপর থাকলে তোমাদের মত আমিও নিজের শক্তিতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো, দাদা। বসে বসে করবোই বা কি? দরখাস্ত আমি ইতিপূর্ব্বেই কয়েক জায়গায় করেছি। তুমি ভেব না দাদা, চালিয়ে আমি ঠিকই নিতে পারবো। যে পথে আমি বাস্তবিকই সুখী হবো সে পথে তোমার আশীর্ব্বাদ যেন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে।

ওর দাদা ব্যথিত স্বরে বল্লেন—যা ভাল বুঝিস্ কর, বোন্। আমার বিচার বুদ্ধির কাছে তোর আত্মচেতনাকে খাটো করতে চাই না! আশীর্ব্বাদ করি তোর সুশিক্ষিত মনের মূলে জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক—সে আলোকে নিজেকে চেনার সাথে সাথে আর পাঁচ-জনেও পথ খুঁজে পা'ক।

সেই থেকে মীরা একটা স্কুলে কাজ নিল - তখন ওর বয়স একুশ কি বাইশ।

একাদশ পর্য্যায়

শরতের সকাল। আকাশে ছড়িয়ে গেছে প্রভাত সূর্য্যের কিরণ-মালা। নবদিনের হোলি-উৎসবে যেন মেতেছে আকাশের ছিন্ন-মালা। কলিকাতার বাড়ীতে বাড়ীতে ঠাসা পল্লীগুলির কোন কোন বাটী যেন 'ডিঙি মোর ধরতে চায় রঙীন মেঘাঞ্চল'। ছোট ছোট্ বাড়ীগুলি তাদের পিছনে পড়ে আছে নির্জীবের মত—মহীরুহের তলে ক্ষীণ পাণ্ডুর চারা যেন—বৃদ্ধি নেই, রঙ নেই, প্রাণ নেই।

মীরাদের বাড়ীটা এ পাড়ার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সামনে খানিকটা খোলা ময়দান বাড়ীটাকে রেখেছে মর্য্যাদাবান্ করে। গেটের পাশে মোটর গ্যারেজ। সামনেই একটা ছোট-বাগান ফুলের বিচিত্র বর্ণ ছিটানো আছে চতুর্দ্দিকে, মাঝে মাঝে বিরল ফুলের গাছও। মধ্যে সিমেণ্ট বাঁধানো গোল চত্তর, তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন মীরার বাবার প্রস্তরমূর্ত্তি। ছোট দোতালা বাড়ী পিঙ্ক রঙের। ভবানীপুরের এই জায়গাটা কিনে ঘর বেঁধে গেছেন ওর বাবা।

মীরার আলুলায়িত বাঁধনহীন দেহ পড়ে আছে শয্যার ওপর, তখনো আবেগ মগ্ন। বদ্ধ ঘরের আবহাওয়ার মধ্যে আলুর ডগার মত নিজের লালিত্যকে বজায় রাখবার চেষ্টা না করে যে সব মেয়ে বাইরের কর্ম্মজীবনকে বরণ করে নিয়েছে তাদের অধিকাংশ জনেরই দেহে কেমন জানি একটা রুক্ষতা চেপে বসে—হয়তো কর্ম্মজীবন

তাদের মানস জীবনের সাথে ঠিক খাপ খায় না বলে। মীরার দেহ দেহ দেখলে সে কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। ও যেন সূর্য্যমুখী ফুল—খোলাদিনের রৌদ্রকে সহ্য করবার আন্তরিক প্রেরণা আছে। ধারাল চোখমুখ থেকে যে সৌন্দর্য্যের দীপ্তি ফুটে বেরয় তা শিক্ষিতা-সাধারণ নয় যদিও ওর গায়ের রঙ যাচাই করতে গেলে খুব বড় সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। তবু ওর মধ্যে সব থেকে আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে উচ্ছল প্রাণশক্তির দীপ্তি, যাতে ওর অহঙ্কারবিহীন ও গভীর শিক্ষা একটা স্নিগ্ধতা আর প্রশান্তি এনে দিয়েছে। আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েদের ভিতর ওই প্রশান্ত মধুরতার প্রকাশ কোথায়? কলেজে পড়া বা মাষ্টারী করা মেয়েদের দেখলেই বলে দেওয়া যায়। হয় তাদের দেহের সর্ব্বত্র কলেজী ক্লেশের ছাপ পড়েছে, নয় মনে এবং মুখের কথায় তার জ্বলন্ত পরিচয় প্রকাশমান। মীরার জীবন ওই দুটো স্তরের মধ্য দিয়ে বহমান্ হলেও ওর বর্ত্তমান দেহকে, দেহের স্নিগ্ধতাকে বজায় রাখতে পেরেছে এই মন্ত্রবলে যে—শিক্ষা ও শিক্ষাদান দুটোকেই ও অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পেরেছে।

ঘুম থেকে উঠে মীরা বেশ-বদল করে নিয়ে ওর বাড়ীতে এসে বসলো। বড় ভাল লাগে ওর এই ঘরটা। এইখানেই বসে বসে ও জীবন কাটিয়ে দিতে পারে—মাঝে মাঝে এই কথা ওর মনে হয়। তাই যতক্ষণ ও বাড়ী থাকে তার অধিকক্ষণই ও বই খুলে বসে থাকে আর নয় খানিকটা পাশের ঘরে যেখানে সাজানো রয়েছে—পিয়ানো, অর্গ্যান, সেতার।

বাড়ীতে ঢুকে ও খানিকক্ষণ চেয়ারটায় চুপ করে বসে রইল।

চাকর এসে 'পানীয়ন' মেশানো গরম দুধের গ্লাস আর চারখানা ছোট্ট লুচি টিপয়টীতে রেখে গেল। দেশী 'পানীয়ন' থাকা সত্ত্বেও বিলাতী ওভ্যাল্‌টীনের নাম গালভরে উচ্চারণ করতে ওর লজ্জা করে। মীরা নিজে দেহটাকে দুম্‌ড়ে মুচড়ে কর্ম্মপ্রবণ করে তুলবার চেষ্টা করে দুধের গ্লাসটা তুলে নেয় ঠোঁটদুটীর কাছে। এর মধ্যকার পানীয়ের রঙ ও গন্ধটায় যেন গ্লাসটাকে ও আদর করতে চায়। হাল-ফ্যাসানী মেয়েদের মত চায়ের পাত্র নিঃশেষ করে নিজেকে নিঃশেষ করার চেষ্টা ওর ভাল লাগে না—এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন ওর বাবা, তিনি নিজে যদিও অত্যধিক চা-পিয়াসী ছিলেন।

প্রাতরাশ শেষ করে ও চোখদুটীকে মেলে ধরলো বাইরের দিকে। কত বিচিত্র মানুষ যাতায়াত করছে।

—কে! চপলবাবু না?—মীরা মুহূর্ত্তে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। জানালার কাছে এসে লক্ষ্য করে দেখবার চেষ্টা করে—ভাল দেখা যায় না। ও ছুটে গেটের কাছে আসে। দ্রষ্টব্য ব্যক্তিটী তত-ক্ষণে খানিকটা এগিয়ে গেছে। ও একবার ভাবে নিজেই ছুটে যাবে রাস্তা দিয়ে--কি হয়েছে তাতে? লোক-সমালোচনার যুপ-কাষ্ঠে নিজের প্রাণশক্তিকে মেরে ফেলার কোন মানে হয় না। --ওর পায়ে জোর আছে তাই ও এই সকালে একটু দৌড়ে নেবে, বেশ করবে—ও ভাবে। আবার অন্য ভেবে ডাকে—রঘুনাথ। রঘুনাথ কাছে এলে বলে—ওই যে ভদ্রলোক যাচ্ছেন না······ঐ যে ডানদিকে উল্টো ফুটপাথ দিয়ে···ওঁকে ডেকে আনতো। কি—বলবি আবার কি! ভাত খাস্ কি করতে?······আচ্ছা, তুই যা আমিই যাবো···কিন্তু একটু

আগেই যে ছাত্রী থাকে দুটো। যদি দেখে ফেলে কোন রকমে যে ওদের স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস্ রাস্তা দিয়ে দৌড়েছেন, তাহলে হয়তো ওরা ছুটেই আসবে কোন বিপদ হয়েছে ভেবে। যাকৃগে উনি চপলবাবু নাও হতে পারেন। চপলবাবু কি করতে আসবেন এই তিনক্রোশ দূরে এত সকালেই! হয়তো বা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছেনই এখন।

মীরা ফিরে আসে ওর ষ্টাডীতে। এই ছুটোছুটীতে ওর দেহের জড়তা কেটে যায়, মন হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ। র‍্যাকের মাথা থেকে স্কুল থেকে আনা খাতাপত্রগুলো পেড়ে নিয়ে হিসাব দেখতে বসে পড়ে, হিসাব নিকাশ চুকিয়ে রাখতে হবে এই কদিনে, নইলে সামনের সপ্তাহেই মিসেস্ মুখার্জী হয়তো এসে পড়বেন ইন্‌স্পেক্‌শানে। তাঁর বাঁকা দৃষ্টি সহ্য কর'বে কে বাবা। মিস্ মীরা সেনের দাদা তো আর তাঁর স্বামীর বন্ধু নন যে, কিছু না দেখেই রেকর্ডবুকে লম্বা যশোগান লিখে যাবেন। ও নিজেও তাঁর ছাত্রী নয়, আর এমনি ধারার করুণা নিতে ওর মনে ঘৃণাও জাগে—যেটা কুকুরে কুকুরে গাত্রলেহন করারই সামিল। তাই খাতাগুলোর ওপর ও তীক্ষ্ণ মন আর দৃষ্টি সঞ্চারিত করে দেয় আর ওর কলমটা চলে খাতাটার বুকে দাগ কেটে কেটে। এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ মিষ্ট্রেস্‌দের ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে নিজে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসতে ওর আত্ম-সম্মানে লাগে, ভাবে—যারা পদমর্য্যাদায় ও শিক্ষায় আমার নিম্নস্থানীয় তাদের কাছে নিজেকে কেন সমালোচনার সামগ্রী করে তুলবো?

তিরিশটা মিনিট কালের ভাণ্ডার থেকে পলাতক হয়ে যায়। মীরা কলম রেখে চেয়ারে একটু হেলান দিয়ে নেবার ইচ্ছা করে।

এই অবসরে ওর মন যেন উধাও হয়ে যেতে চায় কোন সুদূরে। কর্ত্তব্যের কড়া রাশ টেনে ও তাকে ফিরিয়ে আনতে চায়। নাঃ, ওর মনটা আর কাজে বসতে চাইছে না—দুষ্টু ছেলের মত খালি পালিয়ে যেতে চায়, এড়িয়ে যেতে চায় বাঁধন। এমনি করে কি কাজ করা যায়? হয়তো কোন অজানতেই প্রবেশ করবে মারাত্মক ভুল।

খাতা মুড়ে রেখে মীরা উঠে আসে ইজি চেয়ারটায়। ওর মনে ভেসে আসে কালকের সন্ধ্যার কথা। ভাবে—কি সুন্দর চপলবাবুর বলার ভঙ্গী—কোথাও একটু বাধে না, অবিন্যস্ত হয়ে পড়বার আশঙ্কা নেই, প্রাণ-রসে সিঞ্চিত প্রত্যেক কথাটা। যুক্তির গাঁথুনীতে ওঁর বক্তব্যকে করে তোলেন পাথরে গাঁথা ইমারৎ, যেখানে সমালোচনার পেরেক বসাতে গেলে পেরেকই যায় বেঁকে। মীরার স্বীকার করতে আনন্দই হচ্ছে যে—হ্যাঁ, চপলবাবু সত্যিই একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি, যিনি নিজের শক্তিতেই উঠবেন কোটীজনের মাথা ছাড়িয়ে। পাতলা দেহটা যেন শাণিত তরবারি—মুগ্ধ করে কিন্তু এগুতে সাহস হয় না।

মীরার মন এগিয়ে যেতে চায়, নেমে আসে রাস্তায়।

– "ও, আমাকেই বলছেন বুঝি।······আজ্ঞে···তা নমস্কার···ও হয় বুঝি?···তা আমি······ও, সোম নয় সেন"······বেশ মানুষ, মীরা ভাবে,—লোকারণ্যের মাঝে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহীরুহ। সত্যিকার ভাবুক, নিজের ভাব-সলিলেই আছে ডুবে—মীরার মত। ওপর থেকে দেখে বোঝা যায় না কত জলে বাস করেন—নিঃশব্দচারী মীন—আস্ফালন নেই, আছে স্তব্ধ সঞ্চরণ। জল ঘোলায় না, শুধু ভেসে আসে মনোহারী দুই একটা ঢেউ।

মীরার বড় ভালো লাগে এই রকম মানুষকে ভাবতে। মুখের বাক্যের তোড়ে যারা জাহির করতে চায় নিজেকে, ও তাদের ঘৃণা করে। চপলবাবু সত্যিকারের দরদীপ্রাণ, ছোঁকেনি সংসারের আবিলতা।

—"ভুল করাই যে মানুষের স্বভাব মিস সেন।······বাড়ী পর্য্যন্ত টেনে এনে খুব কষ্ট দিলাম আপনাকে······আমি?······হয়তো চাই, নয়তো চাই না—অদ্ভুত মানুষ। মীরার চোখ বুজে আসে চেয়ারের গায়। মনে মনে ভেবে চলে কাল যা যা ঘটেছিল। সত্যিই উনি তাহলে বিরক্ত হননি? কিন্তু কে জানে—সহজ ভদ্রতা বাঁচানো পরিচয় প্রসঙ্গে যা বলা উচিত তাই হয়তো বলে গেছেন—অন্তরের সংযোগবিহীন শূন্যগর্ভ শব্দশ্রেণী। তাই যদি হয়? ও ভাবতে বসে। যেখানে ও নিজেকে অপমানিত মনে করে—আত্ম-বিশ্বাসে আঘাত লাগে বোধ হয়। ভাবে—বাড়ী গিয়ে উনি হয়তো খুব খানিকটা হেসেই নিয়েছেন মনে মনে। ছি ছি, কি ছেলেমানুষীই ও কাল দেখিয়ে ফেলেছে। মীরার সারা দেহে এক আড়ষ্ট ভাব আসে।

একই চিন্তাকে মীরা ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। নাঃ, মানুষটা একেবারে সোজা, সরল। যা বলেন অন্তর থেকেই বলেন—ওঁর বক্তৃতাই তো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রাণের সংযোগ বা ছল-মুক্তি না থাকলে কি কেউ এরূপভাবে বলতে পারে? কথা বলার সময় মনে হয় যেন উনি নিজে কথা বলেন না, কথা কয় ওঁর প্রাণ।

মীরা আবার চঞ্চল হয়ে উঠে বসে। ষ্টাডী ছেড়ে বাইরে এসে ডাকে—হরিসিং। বাবু কব্ বাহার হোয়েগা?

সাড়ে দশ বাজে।

ও ছুটে দাদার ঘরে যায়। দরজা পর্য্যন্ত মেলা মানুষ দেখে ফিরে আসে। ওর দাদা বুঝতে পেরে উঠে আসেন।

—কিছু বলছিলি, মীরা?

—তুমি কখন বেরুবে, দাদা?

—কেন বল দেখি, দরকার আছে কিছু?

—না, এমন আর কি। তবে গাড়ীটা খানিকক্ষণ নিয়ে যাবার যদি···

—হুকুম দিতে, কেমন? দুষ্টুমেয়ে, তাও আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়?

—বাঃ, তুমি যে কোর্টে বেরুবে।

—তাহলোই বা। রাস্তা দিয়ে কত গাড়ীই তো যাচ্ছে। আর গাড়ী চাপিয়ে চাপিয়ে তো তোরা বাত ধরাবার উপক্রম করলি। এই তো কোর্ট, খানিকটা হাঁটলে যদি হাঁটুর ব্যথাটা সারতো।······

—অমনি তোমার হাঁটুতে বাত ধরলো? যাও, তুমি ভারী মিথ্যে কথাটা বলো। সেই এতটুকু বেলায় মিথ্যে বলে বলে ঠকাতে, আমি কি এখনো সেই কচিমেয়েই আছি নাকি মনে কর?

—নাঃ, মাননীয়া হেড্ মিষ্ট্রেস্ মহোদয়া সম্বন্ধে সে কথা বল্লে যে স্কুল উঠে যাবে—দাদা হেসে ওঠেন।

—হুঁ চাকরী করি বলে তুমি খালি···হ্যাঁ যাও।

ওর দাদা মীরার পিঠ চাপ্ড়িয়ে বলেন—যাঃ, পাগলামী করিস্ নে। এখন গাড়ীর কোন প্রয়োজনই হবে না আমার। আর তোর দাদা যে পুরুষ মানুষ, সে কথা স্বীকার করতে চাস্নে কেন?

মীরা আনন্দে পা নাচাতে নাচাতে বলে—তোমার বেরুবার আগেই আমি এসে পড়বো, দাদা। আমাকে যে স্কুলে যেতে হবে তা বুঝি তোমার মনে নেই?

—বারে? তাও বুঝি আমাকে মনে করে রাখতে হবে? শরীরটা তোর খারাপ লাগছে বলছিলি যে কাল রাতে—না-ই বা গেলি আজ।

মীরা গম্ভীর হলে বলে—তা কি করে হবে দাদা। মিসেস্ মুখার্জ্জীর যে আবার আসবার কথা আছে শীঘ্রই।

—যা বুঝিস্ কর বাপু। আমাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করবার দরকার হয় কেন—কচি খুকীর মত? আমি কি বুঝি ওসব? আইনের প্যাচ ঢুকে মাথাটা আমার গেছে।

মীরা ওর দাদাকে টিপ্ করে এক প্রণাম করে নেয়।

ওর দাদা বলেন—এই দেখ, আবার পাগলামী সুরু করলি। একেবারে ছেলেমানুষ।

মীরা দাদার সমুখ থেকে ছুট্ দেয়। ওর দাদা গিয়ে আবার কাগজপত্র আর মক্কেলের মধ্যে ডুব দেন।

দ্বাদশ পর্য্যায়

—কিধার যায়েগা মাইজী ?

—সারকুলার রোড্ পাকড়ো।

মীরা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে গাড়ীর মধ্যে। মোটর রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে চলে নিঃশব্দ গতিতে। মাঝে মাঝে শুধু গিয়ার বদলানোর ছন্দ বদলায়। মীরার মন কোন সুদূরে ভেসে বেড়ায়। কিন্তু কোথায় চলেছে ও! কি কাজই বা পড়লো এখন ? নিজেকে নিজে ও জিজ্ঞাসা করে—

—কোথায় চলেছ মীরা ?

মন অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দেয়—ঠিক জানি নাতো।

তবে কাজ ফেলে রেখে বেরুলে যে বাড়ী থেকে ?

—এমনিই ; ভালো লাগছিল না তাই। না না ভালো লাগছিল তাই। দেখছো না শরতের আকাশ ?

—তাতো দেখছি। কিন্তু শুধু শরতের আকাশই কি প্রেরণা দিল এই বহিরাগমনের ?

—তা ছাড়া আর কি বল।

—শরতের আকাশকে উপভোগ করতে বুঝি সারকুলার রোড্ ধরতে হয় ?

—তবে কোথায়ই বা যাই ?

—কেন, লেকে না হয় টালিগঞ্জের দিকে ষ্টিয়ারিং ঘোরাতে বলতেও তো পারতে, মীরা?

—ও দিকটা যে ভারী নির্জ্জন।

— জনতার সঙ্গে বুঝি প্রকৃতিকে চেনা যায় বেশী!

—যায় না? তবে বলি ষ্টিয়ারিং ঘোরাতে। বেড়াতে আর ভালো লাগছে না, অনর্থক ঘুরে মরা।

—আহা, চট্‌ছো কেন? এরই মধ্যে মত বদলানো ভাল কি? তার চেয়ে এগিয়েই চলো। জনতার মধ্যেও হয়তো আনন্দ মিলতে পারে, বলা তো যায় না। কতদূর যাবে বলে মনে হয়?

—এই শ্যামবাজারটা ঘুরে আসবো আর কি।

—মাণিকতলার পাশ দিয়ে তো?

—ক্ষতিই বা কি?

—না, ক্ষতি কিছুই নয়। তবে একেবারে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত আজ আর না-ই বা গেলে। নিজেকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে লাভ কি? আচ্ছা, হঠাৎ গিয়ে, চুপিচুপি পিছন থেকে এগিয়ে চপলবাবুকে গুড্‌মর্ণিং করে এলে কি হয়? কথাটা কি মন্দ বলেছি আমি?

—কথাটা মন্দ বলনি বটে, কিন্তু কি ভাববেন উনি তাহলে?

—কি আর ভাববেন? একটা আজুহাৎ দেখিয়ে দিলেই চলবে'খন।

—নাঃ, তা হয় না। এত অল্পেই? মেয়ে হয়ে সেধে······নাঃ, মর্য্যাদা কমতে পারে।

—সেধে আর কোথায় হলো? আর মেয়ে বলে কি কিছুই শোভন হবে না?

—তুমি কি বুঝতে পারছো না যে। বলছিতো মর্য্যাদার কথা।

—মর্য্যাদা! নাঃ, তুমি হাসালে মীরা। চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে আবার মর্য্যাদা কি?

—তুমি নেহাৎ অসংযতের মত কথা বলছো দেখি। এত পড়ে শুনেও যদি…

—ওসব পড়াশুনাতো মামুলী গৎ বাজাতে শেখা। প্রাণের প্রেরণায় যে সুরের উদ্ভব তার পরিমাপ ওই লেখাপড়ার গজকাঠিতে করা যায় না, মীরা।

—কথাটা বলেছ মন্দ না। তবু……নাঃ, তা হয় না। সন্দেহ জাগতে পারে।

—তা বটে। তবে চলো ফিরে যাওয়া যাক্। অনর্থক শ্যামবাজার পর্য্যন্ত গিয়েও লাভ নেই।

সারকুলার রোডে পড়ে সোফার জিজ্ঞাসা করলো—মাইজী, কীধার?

মীরা কিছুই ঠিক করতে না পেরে জবাব দিল—চলো বাঁয়া তরফ।

একটু পরেই গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেশনের সামনে এসে পড়লো। মীরা সোফারকে গাড়ী ধারে লাগাতে বলে নেমে চললো ষ্টেশনের দিকে। হুইলার ষ্টলে এসে খানিকক্ষণ এ-বই সে-বই নাড়াচাড় করে একটা ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন্ কিনে নিল। সেটাকে হাতে করে গাড়ীতেই ফিরে এসে সোফারকে বলে দিল—বাড়ী চলো। সোফার গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে সুরু করলো।

মীরা ম্যাগাজিনটার পাতা ওল্টাতে সুরু করে দিল গাড়ীর ভিতর

বসেই। নাঃ, ভালো লাগে না ছাই—ম্যাগাজিনটা ও মুড়ে পাশে ফেলে রেখে দিয়ে কোণটায় কাৎ হয়ে বসলো। মনে যেন কিছুতেই শান্তি আসছে না। মনের ভিতর কত প্রকার কল্পনা যে আশ্রয় করতে লাগলো তার ঠিক নেই। মানুষ এত কল্পনাও করতে পারে। পরম শত্রু মানুষের এই মন।

—একি করলে মীরা? গেলে না মানিকতলা পর্য্যন্ত?

—কি প্রয়োজন?

— কেন চপলবাবু সাথে......

—আবার সেই কথা? তিনি কি বাড়ী আছেন ছাই?

—নিশ্চয়ই আছেন। তিনি তো কুণো মানুষ শুনেছো মৃণালবাবুর কাছে।

--তাতো শুনেছি বাপু, কিন্তু......

—আবার কিন্তু? নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। নিয়ত দ্বিধা আর সংকোচের বোঝা বয়ে বেড়ানোই কি মানব জীবনের উদ্দেশ্য?

—বেশ কথা, মানব-জীবনের কি উদ্দেশ্য এক কথায় আমাকে বলে দিতে পারো? সত্যি, তাহলে অনেক ঝঞ্ঝাট কমে যায়।

—তুমিও তো মানুষ, না কি? একটা উদ্দেশ্য ঠিক করে ফেল্লেই তো পারো। তা নয় হাজারো রকম পুঁথি পড়ে হাজারো নৌকাতে পা বাড়াতে চাও। জীবনের নৌকা যে তাতে বান্‌চাল হবে জানো না?

—বুঝি সবই, কাজে করে উঠতে পারি কই?

—ছাড়ো ওসব হিসাব নিকাশ। চলো চপলবাবুর বাড়ী পর্যন্ত, কেমন?

—নাঃ······তা হয় নাহে বাপু।

—কেন, শুনি?

—কেন আবার কি! আমি কি এতই সস্তা?

—সস্তা! ভালোবাসার মধ্যে কি দাম কষাকষি চলে?

—কি বল্‌লে, ভালোবাসা কি একদিনেই জন্মায়?

—নাঃ, এবার তুমি সত্যিই হাসালে। একদিন তো বহুসময়। না দেখেই লোকে ভালবাসে, শুধু গল্প শুনে। আর তুমি বলছো কিনা একদিন? মুহূর্ত্তের দেখাতেই জগৎ উল্টে যায় তা কি জানো না?

—তোমার কথাগুলো লাগছে মন্দ নয়, কিন্তু চপলবাবু যদি ভুলে গিয়ে থাকেন?

—নিজের গভীরতা দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনবে।

—তা কি সম্ভব?

—কেন সম্ভব নয়? তবে আর ভালোবাসা কি হলো?

—বুঝলাম। কিন্তু স্বভাব যে বাধা দেয়। সংস্কার যে পথরোধ করে দাঁড়ায়।

—পুরাতন থেকে নূতনে আসতে গেলেই লেগে থাকে একটু আধটু সংঘাত। তার জন্যে পুরাতনকেই যে ধরে থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। দেহ বল, শিক্ষা বল আর নীতি বল এরা সবাই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। জীবন স্রোত বয়ে চলেছে। তোমার মনকে

সেই স্রোতের অনুকূলে বইতে দাও। তা নইলে বদ্ধ থেকে যে তার সক্রিয়তা যাবে মরে। লগ্ন যে বয়ে যাবে ফুল-ফোটাবার, গন্ধ বিলাবার ; সার্থব হবার, সার্থক করবার।

—কিন্তু সমাজ যে বাধা দেয়।

—আহা, বললুমই তো—বাধা একটু আধটু আসবেই। তাবলে সমাজের সমালোচনার মশানে প্রাণশক্তিকে, জীবনের অর্থকে বলি দেবে? সেইটাই হবে মনুষ্যত্ব! আর বাধাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়ার কোন মূল্য নেই!

—তবু সংসারের মোহ যে কাটে না গো। তা'থেকে মুক্তি পাবার উপায় বাৎলাতে পারো বাপু?

—ধীরে ধীরে ওর শিকল কাটবে, মন সহ্য করতে শিখবে। জান্ না থাকলে মানের দাম কোথায় বল? নাসিকা কুঞ্চিত করা যাদের স্বভাব তাদের বোঝাবে কি করে শুনি? জানো নাকি ওইসব পর-চর্চ্চার উদ্ভব কোথা থেকে? ওরা নিজেরা জীবনে বঞ্চিত—তাই হিংসায় ওরা জ্বলে মরে, নয়তো ওরা নিজেরাই মহা লম্পট তাই সত্যকার ভালোবাসার ভিতরও ওরা লাম্পট্য দেখতে পায়। তোমার মুখ দেখলে ওরা হিংসায় জ্বলে বক্র সমালোচনা করতে বসে, আর দুঃখ দেখলে মুখ ফিরিয়ে হাসে।

একট কড়া জার্ক পেয়ে মীরার কল্পনা-জাল গেল ছিন্ন হয়ে। সোফারকে বলে দিল—জোরসে হাঁকো। গাড়ীর বেগ বেড়ে চল্লো। অদ্ভুত এই গতি। ওর সাথে মনটাও ছুটে যেতে চায়। শন্‌শন্ করে দুপাশের লোকজন, বাড়ীঘর, দোকানপাট ওর পিছন

দিকে ছুটে চলেছে। মীরা চোখ মেলে চেয়ে রইল বাইরের দিকে—চিন্তার জালকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ও ছিড়ে ফেলতে চায়। গাড়ীটা যদি আরো জোরে চলতো—আরো, আরো, তাহলে মীরা যেন বেঁচে যেত। ওর মনের পাখী ডানা মেলেছে, তাকে যেন কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছে না। মনের এই মুক্তিকে ও কখনো ভাবে বিজয় আবার কখনো পরাজয়। বিচার আর নীতির তার দিয়ে ঘেরা সংস্কারের সোণার খাঁচা দেখিয়ে মীরা বন্দী করতে চায় ওর মনকে। মন পোষ মানে না; মানতে চায় না—উন্মুক্ত আকাশের গায় সে যেন হারিয়ে যেতে চায়।

গাড়ী গেটে ঢুকতে না ঢুকতেই মীরা গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে। তারপর আধঘণ্টার মধ্যেই তৈরী হয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়ে স্কুলে।

স্থাপিত ১৩৫১ সাল

ত্রয়োদশ পর্য্যায়

চপল মিশুক মানুষ নয়, অথচ ওর অন্তরটা আজকাল হয়ে উঠেছে বড়ই চঞ্চল। বাইরে বেরুতে ওর মন চায় না, অথচ ভিতরে বসে থাকতেও কেমন জানি লাগে। চেয়ার টেবিলের সাথে কথা বলা চলে না, কারণ সেখানে প্রতিদানের আশা নেই - যেমন একটানা সুতো দিয়ে কাপড় বোনা চলে না, আপনা আপনি এলিয়ে পড়ে, বাধন থাকে না। কখনো কখনো দুপুর রোদের মাঝে বেরিয়ে পড়ে রাস্তার উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে, আবার কখনো কখনো কলম চালাতে চালাতেই জমিয়ে তোলে গল্প নিজের সাথে নিজে। হঠাৎ কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল ও বুঝতেই পারলো না—যার জন্য ভিতরে ভিতরে এই পরিবর্ত্তনটা এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।

আজ চপল সূর্য্য ওঠবার আগেই শয্যাত্যাগ করেছে—যেটা ওর অভ্যাস বিরুদ্ধ। দরজা খুলে ছাদের ওপর এসেছে, যেখানে ওর এই হয়তো প্রথম পদার্পণ। পাত্‌লা মেঘগুলিকে কে যেন ওড়নার মত উড়িয়ে দিয়েছে আকাশের গায়ে—ওর যে আজ তাই বলে মনে হচ্ছে। দিগন্তের ওপার থেকে সূর্য্যের লালিমা এসে বিছিয়ে পড়েছে ওই মেঘাম্বরের ওপর—সোনার জড়ি দিয়ে যেন মুড়বার চেষ্টা। চপলের এসব কবিতা আসে না, নইলে ও একদিন রবিঠাকুরকে নিশ্চয়ই ভাবিয়ে তুলতো। তবু ও চেষ্টা করে দেখবে একবার এই ভালো লাগাকে ছন্দে বেঁধে ফেলতে পারে কিনা।

মীরা হয়তো এতক্ষণ উঠেছে—ও ভাবে। সোনার আলোর এই সুধা সেও হয়তো পান করছে অঞ্জলি ভরে—আকণ্ঠ। কচি কচি নরম ঘাসের ওপর দিয়ে তার চেয়ে নরম পা দুটোকে ও হয়তো চালিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। শিশিরের মুক্তাবিন্দু হয়তো ঠিক্‌রে পড়ছে ওর প্রতি পদক্ষেপে।

চপল ভুলেই গিয়েছিল—ও বসে আছে ওদেরই বাড়ীর ছাদে। মনটা ওর দুরন্ত হয়ে উঠেছে, কিছুতেই বাঁধন মানতে চায় না। এতদিন যে ছিল বন্ধ ঘরের ভিতর, রাশ আলগা হয়ে যেতে সে যেন লাফিয়ে বেড়াতে চায় একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। চপল জোর করে ধরে রাখতে চায় কিন্তু চেষ্টা হয় বিফল। চপল মনে জোর আনবার চেষ্টা করে—না, ওকে সাম্‌লাতেই হবে। চপল বসু সাধারণ থেকে আলাদা—তাই ওর বৈশিষ্ট্যকে টিকিয়ে রাখতে হবে, বিলিয়ে দেওয়া চলবে না সাধারণের মাঝে। ওর আছে বিরাট জগৎ, বিশাল ভাব-ক্ষেত্র, অত্যুঙ্গ কর্ম্মশিখর—যেখানে ওকে উঠতেই হবে স্থিরচিত্তে; চঞ্চল হলে পা পিছ্‌লাবে। তাতে যদি ওর সবকিছু বিলাসকে ফেলে এগুতে হয় তাতেও ও রাজী। মনের বিলাসকে ও এতদিন প্রশ্রয় দেয়নি—যা আজ কদিন থেকে ওকে পেয়ে বসেছে। এক জায়গায় আঘাত করতে করতে সেই স্থানটা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে আসে—ওর মনের দুয়ারে এমনিধারা আঘাত নিত্যই চলেছে। প্রীতি, ডলি, অঞ্জলি, সীতা, এরা চেষ্টার ত্রুটী করে নি। আহা, বেচারা ডলি। কোন অপরাধই নেই ওর তবু ওকে ব্যর্থ হতে হলো। তা বলে চপল তো আর নিজের সাধনাকে বিসর্জ্জন দিতে পারে না! আর

ধরে বেঁধে কি কাউকে ভালবাসানো যায়? তাই বলে কি মীরা জিতবে নাকি? ওদের তুলনায় মীরার এমন কিইবা আছে, এক ভাবুক এবং প্রতিভা-পিয়াসী মন ছাড়া? মোহ যখন আসে তখন এমনি অলক্ষ্যেই আসে? চপল কি তাহলে মোহান্ধ হয়ে পড়লো? এর নামই কি ভালোবাসা? প্রেম? চপল তাহলে কি প্রেমে পড়লো নাকি! মোহ আর প্রেম তবে কি একই জিনিষ? চপল নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে। ওর মনে হয়েছে বটে প্রেম অন্তরের, মোহ বহির্জগতের; প্রেম আলোক-পিয়াসী, মোহ আঁধার-পিয়াসী; প্রেম ধ্রুবতারা, মোহ উল্কা। মোহের তবু বিচার জ্ঞান আছে। প্রেম অবুঝ। মোহ বিস্তার করে কুহেলিকাজাল, যা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, আর প্রেম স্বতঃস্বচ্ছ' চির-উজ্জ্বল পথ দেখাবার উদ্দেশ্যে চির দীপ্তিমান্। মোহ এগিয়ে যাবার প্রেরণা কেড়ে নিয়ে বাঁধন দিতে চায়—ক্ষণিকের বাঁধন, আর প্রেম এগিয়ে যাবার প্রেরণা যোগায় মুক্তির মাঝে অমরত্বের রাখী পরাতে। কিন্তু চপল তোমার এ কি? প্রেম না মোহ? এ তোমার ভালোবাসা, না ভালো-লাগা? ভালো-লাগার কারণ থাকে, ভালোবাসা অকারণ—তাকে বিচারের মধ্যে আনা যায় না। কোনটা তোমার বেলায় প্রযোজ্য, চপলবাবু? এ যদি হয় ভালো-লাগা, তাহলে ডলি দত্ত, প্রীতি মজুমদার কি অপরাধ করলো? কোন হিসাবে তুমি তাদের মীরার কাছে ছোট করতে চাও? চপল ভেবে পায় না তার এই পরিবর্তন কিসের কারণে—ভালোবাসা, ভালো-লাগা, না অহেতুক? শেষকালে কি মীরাই হবে জয়ী? এই কি শেষ আঘাত? ওকি পৌঁছেছিল ভেঙে পড়ার শেষ

সীমায় ? চপল নিজেকে বুঝিয়ে উঠতে পারে না কোনমতেই। এক-বার ভাবে ওর সাধনা বিনষ্ট হবে এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়ে, আবার ভাবে ও নবালোক পাবে ওর চলার পথে, ওর সাধনার পথে। মানসীর কাছে ও দিন দিন অধিকতর গৌরবের বস্তু হয়ে উঠবার চেষ্টা করবে—তার প্রেরণা পাবে প্রেমের আলোকে, প্রেমকে অমর করবার প্রচেষ্টায় নিজে হবে অমর, সাধনা হবে বিশ্বরূপ। অথচ মীরার সাথে ওর দেখাশুনা মাত্র চার পাঁচদিনের। কতটুকুই বা জানতে পারা, জানতে দেওয়া। কত অল্পই না পরিচয়! আর মীরা? হয়তো বা সাধারণ পরিচয়ের কামনা তার, কিংবা হয়তো সাধারণ ভাবেই ওর শিক্ষিত মনের খোরাক সংগ্রহ করতে আসা। নাঃ, ও ত্যাগ করবে আত্মঘাতী নীতি। মীরাই হোক আর যেই হোক, চপলের সাধনার কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে।

চপল ছাদ থেকে নেমে আসে অবিন্যস্ত মন নিয়ে। মনকে এই দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করবার জন্য কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে—কিছুদিন আগে আরম্ভ করে যেটা ফেলে রেখেছিল এই কদিন।

ওর ভাব-সলিলে আবার ধীরে ধীরে জোয়ার আসে। মন চলে যায় চটকলের দুর্গন্ধময় এক কুলি বস্তির ভিতর।······অভাবের নির্ম্মম অত্যাচার তখন চিতাগ্নি জ্বালিয়েছে দরিদ্র কুলির কুটীরে। রামুয়া ঔষধ পত্রের অভাবে বিছানার সাথে ধীরে ধীরে মিশিয়ে যায়। ওর উলঙ্গ ছেলেমেয়ে কটা ক্ষিদের জ্বালায় চীৎকার করতে থাকে। ও লিখে চলে—

কলের বাঁশী বাজে।···মৃত্যুশয্যাশায়ী স্বামীকে আর বুভুক্ষিত

ছেলেমেয়েগুলি রেখে রামুয়ার স্ত্রী উপবাস-জীর্ণ দেহটাকে কোনপ্রকারে টেনে নিয়ে চলে জনস্রোতের মাঝে। হাজার হাজার কলের কুলি, হাজার হাজার শোভিত কঙ্কালের মত এগিয়ে চলেছে যন্ত্র-দানবের বিরাট মুখ গহ্বরের মধ্যে। চপলের নিজের চোখ থেকেই জল গড়িয়ে পড়ে।

—চপলবাবু!

মুহূর্তের মধ্যে ওর সকল চিন্তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ক্ষণেকের জন্য কপালে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠে, আবার মিলিয়ে যায়।

—আসুন।

—কি করছিলেন? বিরক্ত করলাম তো! ক্ষমা চাই এর জন্যে।

—ক্ষমা চাইবার কি আছে এতে? মানুষের বাড়ী মানুষ এলে কি বিরক্ত হয় কেউ! অন্ততঃ তাই কি উচিত!

—কিন্তু আপনি তো সাধারণ মানুষ নন, চপলবাবু। আপনি সাধক, আপনার সাধনায় যারা ব্যাঘাত দেয়, তারা তো সব অসুর আর দৈত্যের দল।

চপল হেসে ওঠে, বলে—কিন্তু বর্ত্তমানের অসুরকে অত বেসুর বলে লাগছে না আমার। তাড়কাকে বধ করবার অস্ত্র আমার নেই। তার চেয়ে খানিক ভাল কথাবার্ত্তা বলে উৎপাতের কথা ভুলিয়ে দেওয়াই কি অধিক সুবিধাজনক নয়?

—কি জানি, আপনারা ভাবুক মানুষ। বিরাট কাজের ভার দিয়ে ভগবান্ আপনাদের এই জগতে পাঠিয়েছেন। প্রতিমুহূর্ত্তই আপনাদের কাছে অমূল্য।

মীরা টেবিল্‌টার ধারে এসে দাঁড়ায়। ওর গায়ের মোহময় সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে ঘরটায়।

চপল উত্তর দেয়—তা হতে পারে। কিন্তু ভাবুকরাও যে মানুষ সে কথা ভুলে যান কেন? মানুষ নিয়েই তো তাদের ভাবের বেসাতি করতে হয়, সাহিত্যের পশরা সাজাতে হয়—একথা তো আপনিই বলেছিলেন।

—কিন্তু আড়ালে না থাকলে সব সময় মানুষকে ঠিক লক্ষ্য করবার অবসর মেলে না—মনের কামেরা নিয়ে কিছু দূরে না থাকলে ছবি ওঠানো যায় না যেমন—এটাতো আপনার ধারণা বলেই যেন শুনেছিলাম। সেইজন্য আপনারা, বিশেষ করে আপনি সাধারণের আড়ালে বাস করেন দেখি। জনতার মাঝে এনে হাজির করলে আপনারা চোখে দেখতে পান না, ক্যামেরার লেন্স যায় বন্ধ হয়ে। কেমন, ঠিক বোঝাতে পেরেছি কিনা বলুন আপনারই কথা আপনাকে?

চপল মৃদু হেসে বলে—সব সময় তা ঠিক সত্যিও নয়, মীরাদেবী। স্বাতন্ত্র্যের জাল বুনে রাখলে সব সময় ঠিক চেনা যায় না—নিজেকেও নয়, অপরকেও নয়। আবার জনারণ্যের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিলেও নিজের দৃষ্টি-ফোকাস্‌ রং এ্যাঙ্গেলে এসে যায়। কিন্তু যাক্‌ ওসব কথা। কেমন আছেন তাই বলুন।

মীরা স্মিত হেসে বলে—ভালই তো মনে হচ্ছে স্যার, তা না হলে এতদূর আসতে পারি? আপনি কেমন সে কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে যে।

—আমি? ভাল মন্দ বলে বিশেষ কিছুই নেই, চিরকাল সমান।

—তাই নাকি? তাহলে তো আপনি চির-নবীন।

—নবীন কি প্রবীন বলতে পারি না; তবে যা সত্য তাই বল্লাম—এই বলে ও একটু পাশ কাটাতে চায়।

—মীরা প্রশ্ন করে—কি করছিলেন এতক্ষণ?

—এই ধরুন ছেলে খেলা।

— কাকে নিয়ে?

—যদি বলি নিজের আনন্দকে নিয়ে।

—আনন্দিতই হবো, আর এও জিজ্ঞাসা করবো - কিসের আনন্দ?

—উত্তর দেব আত্ম-বিশ্লেষণের আনন্দ।

—বিশ্লেষণের সূত্র থাকে। এইবার সেই কারণরূপী সূত্রকে অনুসন্ধান করবো।

—কারণ নেই, অহেতুক অকারণ।

—কাব্যের পরিস্থিতি দেখছি যে! রাগের উৎস কোথায়?

—মনে—আস্রোৎ-সারিত প্রবাহ।

মীরা হেসে উঠলো।—বল্লে – কবি মশাই দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠবেন না, আমরা যে পথ হারিয়ে মরবো।

—মিস্ সেন!

—আজ্ঞে না—মীরা।

—কেন কুমারীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন নাকি?

—যান. আপনি ভারী দুষ্টু—মীরা ঘাড় বাঁকিয়ে বলে। আজ্ঞে মশাই ওসব মিস্ ফিস্ তোলা জিনিষ, আটপৌরে ব্যবহার করতে নেই। অতি

পরিচিত মনের কাছে সাদা পোষাকেই আসা বেশী শোভন নয় কি ?

—আচ্ছা······তাই।

—কি তাই ?

—মীরা······

—বলুন উত্তর দিচ্ছি !

চপল মুস্কিলে পড়লো। কি বলা যায় ভেবেই পায় না। ওর বুদ্ধিকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করে।

—মীরা দেবী !

—আচ্ছা না হয় তাই হলো। কিন্তু দেবীটাও পোষাক - স্বভাব বা স্বাভাবিক গুণ নয়।

—মনে রইলো মীরা দেবী।

—আবার দেবী ! পোষাক না পরিয়ে আপনার ভালো লাগে না দেখছি। বলুন কি বলতে চাইছিলেন !

—আজকের প্রভাতটা······

—মানে—আপনি কবিতার ছন্দ খুঁজে······

—তা নয় মীরা দেবী। আমি আজ ভোরে উঠেছিলাম—সেই কথাটাই বলতে চাইছি।

মীরা চপলের মুখের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—কি সর্ব্বনাশ ! চপলবাবু উঠেছেন ভোরে ! যাকে সেদিন বেলা আটটার সময় ঠেলে তুলেছিলাম ! অর্থাৎ আজ রবি ঠাকুরের অবস্থা নিশ্চয়ই কাহিল। উঠেছিল রাঙা রবি আকাশের বুক চিরে ! মেঘেরা উড়ে চলেছিল দলবেঁধে—বলাকা শ্রেণীর মত ? না বলবো রঙীন উত্তরীয় ?

চপল লজ্জিত হয়ে পড়ে, কুনো মানুষটা আবার জাগে ওর ভিতর। ওর মনে হয় নিজের বোকামীর জালে নিজেই যেন আটকে গেছে। মীরা যে এত বাঁকিয়ে কথা বলতে পারে তাত ওর জানা ছিল না। চপল নির্বাক হয়ে বসে থাকে মনের ভিতর সংকোচ আর লজ্জা নিয়ে।

মীরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সেখানে এক পলকে কত পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। নিজেকে ও ধিক্কার দেয়। যা ও শুনতে চাইলো তাকে খুঁচিয়ে বার করতে গিয়ে একি কাণ্ড বাধিয়ে বসলো!

—চপলবাবু।

চপল ঘাড় তুলে তাকায়।

—দেখুন আমি বুঝতে পারিনি যে, আপনার মন এতখানি নরম, অথচ তীব্রভাবে ভালোবাসেন আপনার সাধনার কাঠিন্যকে। আমায় ক্ষমা করুন, চপলবাবু—মীরার কণ্ঠ থেকে মিনতি ঝরে পড়ে।

চপলের ঠোঁটের কোণে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা মিলিয়ে যায়। সুরু হলো অভিমানের পালা।

মীরা ওর সামনে এসে বলে—বলুন কথা, যেমন বলছিলেন।

চপল সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—আপনার স্কুলের কাজ চলছে কেমন?

মীরা ওর হাতখানা ধরে বলে—এখন ওকথা নয়। শুনুন—আমার বাগানে ফুটেছিল প্রভাতী গোলাপ, তাকে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। গ্রহণ করে তাকে সার্থক করুন।

চপল নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে—রেখে দিন ওখানে। হয়তো ওর মর্য্যাদা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

—কোথায় রাখি!

—যেখানে আপনার খুসী।

—আপনার খুসী নেই?

—বল্লুম তো—মর্য্যাদা দেবার আয়োজন নেই আমার।

—অভিমান গেল না এখনো?

— অভিমান নয় মীরাদেবী, অভিজ্ঞান।

অভিমানই ওর বাহক—বলে মীরা টেব্‌ল্‌টায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ায় চপলের একেবারে কাছটীতে। মিনতিভরা চোখদুটো মেলে ধরে বলে—অপরাধের কি ক্ষমা নেই?

—অপরাধ আপনি করলেন কই!

—সে আপনি নিজেই জানেন, আমিও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি অজান্তেই ওই ভুলের মধ্যে পা বাড়িয়ে ফেলেছি। ক্ষমা চাইছি, নইলে প্রার্থনা জানাচ্ছি—কুয়াসার জাল থেকে বেরিয়ে আসুন।

চপল স্মিত হাসি হেসে বলে অতশত বুঝি না মীরা। আমার মনটাই যেন কেমন অদ্ভুত ধরণের। অভিমান আপনার ওপরে নয়; অভিমান আমার নিজেরই 'পরে। কথা যে সাজিয়ে গুছিয়ে সাবধান হয়ে কোনদিনই বলতে শিখলাম না। তাই সহজভাবে যে কথা বলতে চাইলাম—তাতে পেলাম বাধা। স্বভাব খেল ধাক্কা। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের মোহ মাথা তুলে দাঁড়াল, কুয়াশায় মন গেল ছেয়ে। তাই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হলাম নিজেই নিজেরই বিরুদ্ধে। বুঝেছি আপনার অনিচ্ছুক ত্রুটীর গতি, তাই বিদ্রোহের অবসান হলো, কেটেছে কুহেলিজাল। আপনি নির্ভয় হতে পারেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মীরা বলে—উঃ বাঁচলাম।

চপল হেসে বলে—কিন্তু বাঁচালাম আমি নয়; বাঁচালো আমার অন্তরের নবস্থর-প্রেরণা।

মীরা ভ্রূকুটীকে ঈষৎ উঁচু করে বলে—তাই নাকি?

—তাইতো মনে হয়।

—কিসের ওষুধ দিয়ে শুনি?

—মানুষের স্বভাব-ধর্ম্মের ওষুধ বোধ হয়। কিন্তু কি হবে সে কথায়—চপল প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে মীরার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখদুটোকে তখন দেখলে মনে হয় ও বুঝি মীরার মুখের ভিতর কোন এক অভিনব বস্তুর সন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

মীরা নিজের ভিতরই বুকের স্পন্দন অনুভব করে। ওর হৃৎ-পিণ্ডটা সত্যিই দ্রুততর চালে চলতে স্বরু করেছে। এ স্পন্দনের ভিতর এমন এক আবেগ বর্ত্তমান যাকে আবেশ বলা চলতে পারে। অপেক্ষ-মান্ চোখ দুটী মেলে মীরা বলে—আপনার ওপর জুলুম চালাতে ইচ্ছে করছে, চপলবাবু।

চপল হেসে বলে—সইবার শক্তি আছে কিনা না জেনেই?

—জুলুমকারী সে কথা কি কোনকালে ভেবে দেখে?

—তবে জানিয়ে শুনিয়ে জুলুম করবার কোন মানেই হয় না। অজান্তেই জারী করুন জুলুমের আইন।

—প্রথম নম্বর—'করুন' নয় 'কর'।

—কেন, কর-দ রাজ্যের প্রজা নাকি?

—প্রজা নয়গো মশাই, রাজা।

— কিন্তু 'কর'দ রাজ্যের রাজাকে কর দিতে দেউলিয়া হ'তে হ'বে নাতো ?

—না গো রাজা মশাই না, শুধু মহারাণীর আইন কানুন মেনে চল্‌লেই হ'বে।

—দ্বিতীয় নম্বর প্রবর্ত্তিত হোক দেখি।

—প্রয়োজন হলেই হবে। প্রথম নম্বর কেমন কার্য্যকরী হয় দেখি আগে।

—তা নইলে রাজ্য কেড়ে নেবে নাকি ?

—সে আলোচনার উপস্থিত প্রয়োজন দেখছি না। আর হ্যাঁ 'মীরা দেবী' ও নয়। দেবীটা তোলা থাক্ সম্মানের সিংহাসনে।

—তাহাই স্বীকার্য্য, যখন আইন মানতে সুরু করেছি।

- কিন্তু আমি কি বলে ডাকবো বলোতো ?

—সে বিচার আমার হাতে নেই।

- চপলবাবু ?

—ব্যাপারটা তাহ'লে 'করুন'ই হবে।

—উঁহুঃ, চপলদা ?

— সে বিচার আমার হাতে নেই।

— তবে ? মিষ্টার বোস্ ?

—উত্তর দিতে হয়তো ভুলেই যাবো।

—আচ্ছা, কবি ?

—মানাবে না যে।

—তাহ'লে……বন্ধু ?

—মর্য্যাদা দিতে পারবো কি মীরা ?

—ব্যবহারেই জিনিষের আসল মর্য্যাদা, বন্ধু। দেখছো না—তোমার ভোরের আকাশ উঠেছে রাঙিয়ে, আমার গাছে ফুটলো প্রভাতী গোলাপ সে রঙে রঙ মিলিয়ে। নবারুণের সাথে চিরবন্ধুত্ব প্রভাতী ফুলের।

চপল মীরার কথাগুলো নিজ অন্তরে সঞ্চারিত করে দিয়ে বলে চলতে শিখছি মাত্র। এরই মধ্যে দৌড় আরম্ভ করালে তাল সামলাতে পারবো না যে।

—পাশেই রইলুম, সাম্‌লে দেবার চেষ্টা করবো।

—নিজেই হোঁচট খাবে নাতো ?

—না পথটাকে কিঞ্চিৎ বদলে বাধাকে পাশে ফেলে যাবো।

—বটে ? কিন্তু দুনিয়া যে গোলক ধাঁধা। বাধাকে পাশ কাটাতে পথ হারিয়ে ফেলবে নাতো ?

—বেরিয়ে আসবার পথ আমার চেনা আছে মশাই।

—আরো মুস্কিলে ফেল্‌লে দেখছি। সঙ্গী যে দিশা হারিয়ে ভিতরেই রয়ে যাবে গো।

—আলোর নিশান ধরবো যে।

—আলো-আঁধারী সৃষ্ট হবে নাতো ?

—শুনো মশাই, আলোয় পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে সত্য দেখা দেবে যে।

চপল নিজেকে আর চাপতে না পেরে জোরে হেসে ওঠে। টুক্‌রো টুকরো হাসির ছটায় সকল দ্বিধা দূর হয়ে যায়।

দ্বারের কাছে একটা পাত্‌লা ছায়া পড়ে, ওরা কেউই তা দেখতে পায় না। একজোড়া নিমেষহীন আঁখি শূন্য মনে চেয়ে থাকে মাটীর দিকে – নিঃশব্দ, নিশ্চল। চিরকালের জন্য যে বিদায় নিতে এসেছিল, তাকে চোরের মত অলক্ষ্যেই পালিয়ে যেতে হয়, শুধু অলক্ষ্যচারী একটী জীব ওর মনের কথার সাক্ষী হয়ে থাকে, বলে—ডলি, ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্, প্রেমের ডালি ব্যর্থ হলো তোর।

মীরার স্বপ্নালস আঁখি ইতিমধ্যে সচকিত হয়ে উঠে বসে—চলো বন্ধু, বেড়িয়ে আসি। একঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়ে দিয়ে যাবো মায়ের অঞ্চলের নিধি। যাবার সময় মাকে একটা প্রণাম করে যেতে আপত্তি করবে কি?

চপল এর উত্তরে শুধু মৃদু মৃদু হাসে।

চতুর্দ্দশ পর্য্যায়

দুনিয়ায় কে আগে জন্মেছিল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। পুরুষের সৃষ্টিময় সবল ইন্দ্রিয়ের বিশ্রাম বিলাসের ইচ্ছা থেকে জন্মেছে নারী, না পুরুষের কঠিন ত্বকের পীড়ণ পেষণের প্রয়োজন হলো নারীর—সেইজন্য জন্মাল পুরুষ? এ তথ্য আলোচনা করবার স্পৃহা যাঁদের আছে তাঁদের ওপরই সে ভার নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া গেল, এখানে তার বিস্তৃতি ঘটাবার কোন কারণই নেই। পুরুষ দেখিয়েছে পথ নারীকে, না নারী আলো ধরেছে পুরুষের পথে—সে সমস্যার সমাধান এত সহজে হবে না। তবে এখানে জানি মীরাই চপলকে বাহিরে আনলো, যে ছিল এতদিন একাকীত্বের মধ্যে বন্ধ। চপলের জীবনে মীরা এসে হাজির হলো এক ঝলক আলোকের মত, যার প্রকাশে ও নিজেকে সবখানি বুঝতে পারলো। আজ ও নতুন করে চিনলো আপনাকে, দেখলো—যে শিরা তার এতদিন অচঞ্চল ছিল তার ভিতর দিয়ে যেন বয়ে চলেছে তপ্ত রক্তের রঙীন স্রোত। অন্ধকার কোনে নিজের স্বাতন্ত্র্যের সূত্রে বন্ধনবান্ চপল আজ চলেছে মোটরে, তরুণী মীরার পাশে একা।

মীরার সুবিন্যস্ত কেশপাশ হাওয়ার স্পর্শে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, শাড়ী থেকে ছড়িয়ে পড়ে এক অপূর্ব্ব মাদকতা। চপলের আবেশ লাগে। একেই কি বলে ভালোবাসা--যার স্পর্শে অসম্ভবও সম্ভব হয়, কালোর মাঝেও আলো দেখা যায়?

—বন্ধু !

—মীরা !

—কোন পথে চলগে ?

—জানিনা বন্ধু !

— তুমি যে পুরুষ।

—নতুন পথের পথিক আমি। আবেগে নয়ন ছেয়ে গেছে। এ পথের পথ চিনি না যে।

—বন্ধু। কবি !

—উৎকর্ণ আছি দেবী।

—কোথায় চলেছি ?

— জানি না তো ! শুধু জানি, বিশ্বাস করি তুমি দীপশিখা সম।

– তোমার মুখে যে নতুন বাণী !

—নতুনের পথে যাত্রা সুরু তোমাকেই ধরে। কৈশোরের কল্পলোকে হয়তো তুমিই ছিলে রঙ্‌কুমারী। যৌবনের উদ্বেলিত রসাবর্ত্তো জমেছিল বাধা। তুমি আনলে তার অবসান, দ্বিগুণ প্রবাহে তাই সে আজ ছুটতে চায়। বিচার বুদ্ধির আবর্জ্জনা মাঝে মাঝে ভেসে চলেছে স্রোতের সাথে। কোন অলক্ষ্যে হয়তো তাও যাবে মিলিয়ে। আজ নতুন করে যাত্রা সুরু আলোর পিয়াসা কণ্ঠে নিয়ে—তাই তার নতুন বাণী।

—কথা কও বন্ধু।

—শুধু চেয়ে বসে রও দেবী।

মীরা আবেশভরা হাসি হেসে বলে—কবি ! স্বপ্নকে রূপ দেবার

চেষ্টা করছি মনে মনে। তুমি আঁকবে তার ছবি কাগজের পাতায়, আর আমি তাকে বেঁধে রাখবো আমার মানস-পটে। দৃষ্টি-প্রদীপ জ্বালিয়ে চলবে আমার রঙ্-সংগ্রহ। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে সে রঙ।

—ভাষা আমার মূর্ত্তি পাবে সাধন-বীণার সুর সংযোগে। তোমার চম্পকাঙ্গুলী সে বীণার অলক্ষ্য তারে জাগাবে অলক্ষ্য ঝঙ্কার। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে সে গান, বিশ্ব পাবে প্রাণ, অন্তরালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ধরণীর বুকে জাগবে শ্যামলিমা।

ধাক্কা খেতে খেতে গাড়ী বেঁচে গেল। ক্ষিপ্রহাতে ষ্টিয়ারিং কুড়িয়ে নিয়ে মীরা হেসে উঠলে।।

—মীরা!

—বল বন্ধু।

— যাত্রাপথে যে বাধা।

—ভয় নেই, পৌছাতে পারবো, ওরাই যে বিজয়-স্তম্ভরূপে দেখা দিয়েছে।

—বেলা যে বাড়লো মীরা।

—দীপ্ততর হবে বলে জীবনালোক।

—কিন্তু অন্ধকারও যে চুপি চুপি এগিয়ে আসছে। রাত্রি এসে ভুলিয়ে দেবে না তো দিনের স্বপ্নকে?

—নতুন দিনকে বরণ করবার জন্য রাত্রি জেগে মালা গাঁথবো, ধুপ-দানি সাজাবো। উষার আলো আবার জাগবে। আলোর মহিমা বাড়াতেই যে অন্ধকারের জন্ম।

—অন্ধকারের সাথে যে মিথ্যা নেমে আসে।

—সত্যকে বেশী করে চেনা যাবে বলে। আজকের সত্যের মধ্যে যেটুকু খাদ আছে অন্ধকারের মহিমায় কাল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

—পাথেয় যদি ফুরোয়?

—আবার পাথেয় সংগ্রহ করবো বন্ধু।

—পথের শেষ কোথায় বলতে পারো, মীরা? মীরা! মীরা!

- আবার ডাকো গো, আবার, আবার।······পথের শেষ কোথায় জানো? জীবনপথ যেথা মরণের পারে হারিয়ে গেছে।

গাড়ী এসে থামলো টালার এক জন-বিরল রাস্তার ধারে। ষ্টিয়ারিং ছেড়ে মীরা উঠে এল পিছনের সীটে। চপলের হাতখানি কোলের মধ্যে নিয়ে বল্লে—বন্ধু ভুলবে নাতো?

চপল মদালস চোখদুটী মেলে উত্তর দিলে—তোমায় ভোলা অত কি সহজ? জীবনের বন্ধ্যাগাছে তুমিই ফোটাবে ফুল, তুমিই যে দিলে তাতে রূপ, রস, গন্ধ, মধু। শোন আজ আমার কথা—বাস্তব প্রয়োজনের মোটা গুঁড়িটাকে পিছনে ফেলে মন আমার বসে থাকে কল্পনার আগডালে। সেখানে আমি নিজের উচ্চতায় ছোট নই। কিন্তু বন্ধু, বাস্তব জগতের স্থূল জিনিষটাকে নিয়েই তো বাধবে না বিরোধ? তোমাকে পেয়েছি, পেয়েছি তোমার প্রীতি—তাই যে মনের মণিকোঠায় চিরকালের সঞ্চয় হয়ে থাকবে। তার চাবি থাকবে নিভৃতে আমার কাছেই—অন্তস্থলে লুকানো।·········আজ একথা বলতে আমার কোন দ্বিধাই নেই মীরা যে, বাস্তব জগতে দাঁড়িয়ে

আড়ম্বর দেখাবার মত যথেষ্ট সম্পদ না থাকলেও মনের সম্পদে আমি আমি গরীয়ান, আর বিশ্বাস করি এর সৌরভ অবিনশ্বর। বাহিরটাই সব কিছু নয় মীরা, বরং বাহিরটা বন্ধন আনে—অন্তরস্থ আত্মাকে যেমন বেঁধে রাখে স্থূল দেহটা। তুমি থাকবে আমার কল্পলোকের মানস-প্রতিমা হয়ে যার পাদপীঠতলে এনে উপহার দিব আমার বিশ্ব-জয়ী সাধনার অর্ঘ্য-সম্ভার। কিন্তু বাহির জগতের বাস্তব পরিস্থিতির মাঝে সে প্রতিমার যে উপকরণ আভরণের প্রয়োজন হয় তাকে হয়তো যথাযথ রূপ দিতে পারবো না, কারণ সেখানে আমি দীন, সামর্থ্যে হয়তো কুলিয়ে উঠবে না, কারণ ভয় আছে সাধনা ভ্রষ্ট হবার। তা বলে আমার মনকে, একাগ্রতাকে উপেক্ষা করবে কি করে, মীরা? মীরা! মীরা। বল না গো তাকে কি তুমি উপেক্ষা করতে পারো আভরণ-সংগ্রহের অক্ষমতার দোহাই দিয়ে? এখনো বল মীরা—তোমার কাছে কি বড় প্রেম? না প্রয়োজন? প্রয়োজনের পিছনে ছুটতে গেলে প্রেমের হবে অপমৃত্যু—সেখানে বেঁচে থাকে শুধু স্বার্থ আর মোহ। বল মীরা বল, উত্তর দাও! প্রেমের পথে আছে অভিশাপ। সেই অভিশাপই আশীর্ব্বাদ হয়ে দেখা দেয় যদি অন্তরে স্পর্শমণি থাকে। প্রেম আর প্রয়োজন এক সাথে মেটে না, তাকি জানো? একের জাগরণের মাঝে অপরের মৃত্যু নিহিত। ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারছি না হয়তো। শুধু এইটুকু মনে রেখ আমি অর্থকে উপেক্ষা করে পরার্থকে চেয়েছি সারাজীবন ধরে। মীরা, ও কি! কথা কইছো না যে! মীরা! মীরা!

মীরা চোখ বুজে শুনে যাচ্ছিল চপলের উদ্ভাসিত কথাগুলি।

চপলের আকুল আহ্বানে ও সোজা হয়ে বসলো। তারপর বল্লে—মিথ্যা তোমার এ সংশয় বন্ধু। বাস্তব স্বার্থের মোহ না ঘুচলে অন্তরের আহ্বান কানে যায় না। প্রেমের সেখানে আত্মহত্যাই করা উচিত, তা আমি জানি। সেধেই ঘর বেঁধেছি তোমার মানস-লোকে যেখানে কত জনের ব্যর্থ-প্রত্যাগমনের চিহ্ন রয়ে গেছে। স্পর্শমণি পেয়ে কি আর কেউ সোণার জন্যে হাহাকার করে? আমি জানি বন্ধু যে, প্রয়োজনকে পথে ঘাটে উপার্জ্জন করা যায়, আর প্রেমকে অন্তরের খনিতে খুঁড়ে খুঁড়ে আবিষ্কার করতে হয়। আর এও জানি—প্রেম নিজের গরজেই যথোপযুক্ত প্রয়োজনের সমাধান করে।......স্বার্থের অন্ধ সংঘাতে বাহিরের জগত ধুলায় মিশে যাক্ আর না হয় শূন্যে পাখা মেলুক, শুধু জেগে থাক আমার প্রেমের ভেলা তোমার মানস-সাগরের মাঝে চির-সঞ্চরণশীল। ও কথা ছাড়ো বন্ধু। দীপ্ত-দিনের বুকে সঞ্চিত রয়ে গেল আমাদের পরিচয়, আজ তাকে সার্থক কর—এই বলে মীরা চপলের হাতটা টেনে ওষ্ঠে ছোঁয়াল; বল্‌লে—এই রইল আমার আত্মোৎসর্গের চিহ্ন—বলে চপলের কোলের মধ্যে এলিয়ে পড়লো।

বুকের স্পন্দন ধ্বনি পা ফেলে এগিয়ে চল্‌লো সময় মেপে মেপে।

—মীরারাণী!

—বন্ধু আমার।

—চলো ফিরি।

—বেলা বাড়লো বুঝি?

—ফিরবার সময় এল যে।

—ও কথা বলতে নেই, বলো—চলো, ঘুরে চলি।

—তাই চলো। বিশ্ব-স্রোতে গা ভাসিয়ে ঘুরে ঘুরে গ্রাম নগর সমৃদ্ধ করে চলুক আমাদের সম্মিলিত জীবন-ধারা। সার্থক হোক আমাদের চলা। আমাদের মনো-বিনিময়ে দেখা দিক নব পর্য্যায়।

অন্তিম পর্য্যায়

কালচক্রের পেষণে দিনগুলি গুঁড়া হয়ে ঝরে পড়ে কালের অতল গর্ভে।

মানুষের কত নিত্য-নব আশা নিরাশার ফুৎকারে শূন্যে মিলিয়ে যায়। চির-সহা বসুন্ধরা নীরবে সহ্য করে কত অসহায় হৃদয়ের বুক-ভাঙা হতশ্বাস—নটনশীলা প্রকৃতির অন্তরে বাজে ব্যথার নূপুর।

তেমনি প্রভাত, তেমনি আকাশ বাতাস, তেমনি আলোর নাচন পাতায় পাতায়. পাখী গায় তেমনি গান, নদী বহে তেমনি কল-গুঞ্জনে কিন্তু চপলের প্রাণে ওদের কেউই কোন সাড়া জাগাতে পারে না। আকাশের গাঁয়ে তেমনি রঙের উৎসব চলে, চপল ভাবে ওখানে আগুন লেগেছে বুঝি। সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে, চপলের দেহে মনে। অন্তর্দাহে ওর হৃদয় পুড়ে খাক্ হয়ে যায়, কোন সান্ত্বনাই সে মানে না।

টেবিলের কাগজপত্রগুলি উড়ে চলে প্রমত্ত বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে। ও ভাবে—যাক্, ওরা যাক্, যেথা খুসী ওই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক্। ও আজ মুক্তি দিয়েছে সবাইকে। কাউকেই ও আজ ধরে রাখতে চায় না। চলে যাক্ ওরা, চলে গেছে যাঁরা, চলে যাবে হৃদয়ের সকল সম্পদ। মিশিয়ে যাক্ কালের গভীর গহ্বরে বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি। সেই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে ও হানবে অট্টহাসি। সে

হাসিতে কেঁপে উঠুক ধরণীর বুক, স্তব্ধ হয়ে যাক্ তার হৃদয় স্পন্দন। শতধা ছিন্ন হয়ে যাক্ তার প্রতি বন্ধন। ও গাইতে চায় ধ্বংসের গান জাগো, জাগো প্রলয়ের রুদ্র দেবতা, তোমার ত্রিনয়ন হতে উৎসারিত অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যাক্ সব আনন্দ সব আশা।

জীবনায়নের অধ্যায়ে পড়েছে পূর্ণচ্ছেদ। সুর বাঁধতে গিয়ে জীবন বীণার তার গেল ছিঁড়ে, তাই আসে বেসুরা আওয়াজ। জীবনের স্রোতের মাঝে জমে গেছে তুষার শিলা, গতি তার রুদ্ধ তাই ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠে—তার জল। অন্তরের রুদ্ধ প্রবাহ থেকে বেঁরিয়ে আসে বিষ-বুদ্বুদ।

* * * *

চপলের সেই কক্ষ—কোণে কোণে জমেছে ময়লা, কঠিন রুক্ষতা ছড়িয়ে আছে এর অঙ্গে অঙ্গে।

মলিন শয্যায় শায়িত রুগ্ন চপল, শরীর হয়ে গেছে শীর্ণ। স্বতঃদীপ্ত মুখমণ্ডলে পড়েছে বিষাদের কালিমা। শীর্ণ দেহ মিশিয়ে গেছে বিছানার সাথে।

মা বসে আছেন ওর পাশে। ওর মুখের দিকে চেয়ে ওঁর চোখের জল বাধা মানে না। অলক্ষিতে আঁচল দিয়ে মুছে জিজ্ঞাসা করেন কেমন আছিস্, চপল?

চপল মার মুখের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাকায়। চোখের কোণে জমেছে কালিমার কলঙ্ক। 'ভালোই আছি বোধ হয়,—চপল ক্ষীণস্বরে উত্তর দেয়।

মা বিশ্বাস করেন না। তিনি যে বোঝেন ওর এই অসুখের প্রধান

কারণ কোথায়। সান্ত্বনা দেবার, শান্তি আনবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে ওঁর প্রাণটা ছটফট করে। এই সরল, অসহায়, আপন ভোলা ছেলেটীকে তিনি এতদিন মানুষ করে এসেছেন আঁচল চাপা দিয়েই। কোন প্রকারের সংঘাতের মাঝে ছেড়ে দিতে তাঁর মন রাজী হয়নি। নিজে দুঃখ সহ্য করেও তাই ওকে বুকে করে নিয়ে বেড়িয়েছেন। আজ তাঁর চোখের সামনে যে দুর্ব্বার আঘাত এসে পড়লো এই সরল-শিশুটীর ওপর তা সহ্য করা চপলের পক্ষে যে কতখানি কঠিন তা তিনি বোঝেন।

ওর বুকে হাত দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—ব্যথাটা কি কমলো চপল ?

—হাত দিয়ে দেখ না মা কমলো কিনা। তুমি স্পর্শ করলেই বুঝতে পারবে—তুমি তো আমার সবই জানো, আমার চেয়ে বেশীই।··· কিন্তু······ একে যে কমাতেই হ'বে মা।······ওষুধটা সবটা এক সঙ্গে ঢেলে দিতে পারো?······না মা, না তাহলে বোধহয় মরেই যাবো। আমি বুঝতে সুরু করেছি—আঘাতকে নীরবে সহ্য করে তার মুঠোর ভিতর নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ায় সার্থকতা নেই, মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় না তাতে, অগৌরবের কীটগুলো জীবনে জীবনে কিলবিল্ করে বেড়ায়। মা, মাগো। আমি সেরে উঠবো······হ্যাঁ···সেরে উঠছি······সেরে উঠেছি বোধহয় দেখতো। তুমি আমার দেহে মনে হাত বুলিয়ে দাও মা, তোমার সর্ব্বগ্লানি-নাশা আশীর্ব্বাদ ঝরুক্ আমার মাথায়—আমি সেরে উঠি, আমি জেগে উঠি, মা,···আমি দাঁড়িয়ে উঠি—চপল উঠবার চেষ্টা করতে ওর মা আবার শুইয়ে

দিলেন। বুকের স্পন্দন আবার বেড়ে গেল, শ্বাস আসতে চাইল রুদ্ধ হয়ে, ক্ষণিক জ্বলতে চেয়ে চক্ষু গেল স্তিমিত হয়ে।

ওর মার চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগলো। আর্ত্তনাদ-রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন—চপল, মাণিক আমার, একি করছিস তুই! এযে আত্মহত্যা বাবা। ওরে তুই যে সাগরের অশ্রুজলের মাণিক, তোকে যে ফুটতেই হবে বাবা।

চপলের বুকের দ্রুত স্পন্দন ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসে। মুদিত চক্ষুর কোণে জলবিন্দু মিলিয়ে যায়। অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু মেলে ক্ষীণ-স্বরে চপল বলে—মা' আমি যে কাজের মানুষ হবো, নয়? আমার প্রয়োজনেই যে আমাকে উঠতে হবে কর্ম্ম-শিখরে। তুমি বলতো মা আমি সেরে উঠবো তো?

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বলেন—কেন সারবে না বাবা! তুমি যে পুরুষ মানুষ, ভগবানের অভয় দান, দেখাবার অনেক কিছুই যে তোমার বাকী পড়ে আছে। তুমি না সারলে সে কাজের ভার কে নেবে বাবা?—মায়ের কণ্ঠ অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হয়ে আসে।

—হ্যাঁ মা, তাইতো। সেই আশীর্ব্বাদই তুমি করো যাতে আমি সেরে উঠতে পারি আমার নতুন লক্ষ্য-শিখরে। তোমার চপলমণিকে কেউ আর পাগল বলতে সাহস করবে না, সে হবে একেবারে নতুন মানুষ। কাজের জন্যে এক সময় তুমি কত বলেছ, তখন কেন শুনিনি তোমার কথা! মানুষের দাম যে শুধু পরিমাপ করা হয় বাস্তবের নিক্তিতে—সে কথা তখন বুঝতেই চাইনি কেন! আজ আমি চিনেছি এই স্থূল জগতে চলার রাস্তা। আর আমি পথ হারাবো না, এবার

ঘোচাব আমার নিজের কলঙ্ক, তোমারও দুঃখ। কিন্তু মা, আমি বাঁচতে পারবো তো? মাগো, বল না, কেন তুমি কথা কইছো না? ও, বুঝেছি······মা, মা! কই তুমি? আমি যে বাঁচতে চাই, তুমি বল না একবারটী—আমি বাঁচবো কিনা······মাগো বল······মা······ মা···বলো······।

ওর মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ডাক্তার মানা করে গিয়েছিলেন—চপল যাতে উত্তেজিত না হয়। মা তাই ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেন—চপল, লক্ষ্মী বাবা আমার, অত কথা কইতে নেই, ডাক্তার যে মানা করে গেছেন; অসুখ যে ওতে—আরো বেড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবে কি করে? আমার দুঃখ ঘোচাবে কি করে? চুপ করে শুয়ে থাক লক্ষ্মীটী আমার।

চপল তবু স্থির থাকতে পারে না। ওর ভিতরে জেগেছে নব-উদ্দীপনা। সে উদ্দীপনাকে চেপে রাখা দায়।

—মাগো, তুমি বুঝতে পারছো না যে, এতে আমার কোন ক্ষতিই হবে না। ডাক্তার কি করে বুঝবে আমার ভিতরটা? সেখানে মুহূর্ত্তে যে পরিবর্ত্তন দেখা দেয়, তার সন্ধান তারা রাখতে পারে কি? আমি যে ভাল হয়ে গেছি। ডাক্তারকে আসতে মানা করে দিও। আমি যে নব-প্রেরণার মন্ত্রবলে এক মুহূর্ত্তেই সেরে গেছি ভয় নেই, আর ভয় নেই।—কথাগুলো উদ্দাম স্রোতের মত ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। চপল কখন উঠে বসেছিল, আবার এলিয়ে পড়ে।

ওর মা ওকে ভাল করে শুইয়ে দিয়ে বলেন—এমনি করে নিজের ওপর অত্যাচার করবি চপল?

ক্ষীণকণ্ঠে শুয়ে শুয়েই ও বলে—তুমি বুঝতে পারছো না মা। এ অত্যাচার নয়, এ ওষুধের ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া! মাগো, তোমার চপল এবার সেরে উঠেছে যে—ও হাসবার চেষ্টা করে।

চপল আবার উঠে বসে। পিছনে বালিশ রেখে ঠেস্ দিয়ে নিয়ে বলে আচ্ছা মা, জগতে কি বড় বলো তো? আচ্ছা, আমি পাগল হয়ে যাইনি তো? ····বল দেখি—মানস-লোক বড়, না বাস্তব-লোক? দাম কার বেশী—অন্তরের না বাহিরের? আমি জানি তুমি বলবে অন্তরের। · কিন্তু ভুল, ভুল, একেবারে ভুল ও-ধারণা। আমিও ওই ভুল বিশ্বাসই করতাম এককালে। আজ বুঝেছি সে কথা যারা বলে তারা মোহাচ্ছন্ন। বাইরের প্রয়োজন মেটাতে সারা দুনিয়াটা কি করছে দেখছো না? প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী, অভিনয়, সবই বাইরের প্রয়োজনে। এই বিরাট কর্ম্ম-জগৎ ব্যস্ত শুধু বাইরের প্রয়োজন মেটাতে। মনের স্থান সেখানে নেই—সে নিষ্ফল হাহাকার করে মরে বাহির-দরজায়। মানুষ মানুষকে অবহেলা করে, অবিশ্বাস করে, হিংসা করে, অপমানিত করে, উঃ, খুন করে মাগো, মানুষকে মানুষ খুচিয়ে মারে সে শুধু বাহিরের প্রয়োজনে। দেশ-প্রেমের নামে কোটী জনের কল্‌জে ছিঁড়ে ফেলা, কোটী নারীর বুকের সন্তান কেড়ে নিয়ে বোমায় উড়িয়ে দেওয়া, লক্ষ যুগের সাধনার ফলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা—সেও বাহিরের প্রয়োজনে। মাগো শোন···উঃ, বাবা···মানুষ মানুষকে তিলে তিলে না খেতে দিয়ে মারে, বলে—শৃঙ্খলা···ছাই···সে শুধু বাহিরের প্রয়োজনে, স্থূলের প্রয়োজনে, পাশবিকতার প্রয়োজনে। মাগো সমক্ষই বড়ো পরোক্ষের চেয়ে—

মনের কোন দামই নেই। বাস্তব-সম্পদের কাছে মানস-সম্পদের কোন মূল্য নেই, নেই, নেই। তোমার চপল এতদিন বাদে তা বুঝেছে. তাই সে নামতে চায় বাস্তব জগতের বুকে তরবারি হস্তে পাষাণে বুক বেঁধে সে সভ্য হবে।

ওর মা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ওর মুখের দিকে। বুকে তাঁর ব্যথা লাগে।

—কিছু খাবি চপল ?

—ক্ষিদে তো পায়নি মা।

–তা হোক, না খেলে জোর পাবি কেন ?

—ঠিক বলেছ তুমি –জোর পাবি কেন……। আচ্ছা খাবো, তবে একটু পরে, কেমন ? তুমি ততক্ষণ আমাকে একটু কোলে নাও না মা, কতদিন তোমার কোলে মাথা রেখে শুইনি !

ওর মা খাটের ওপর উঠে এসে ওর মাথাটা কোলের ওপর টেনে নেন। চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে বলেন—একটু ঘুমুবার চেষ্টা কর দেখি এইবার।

ও বলে, ঘুম যে আসছে না মা !

—চুপ করে থাকতো দেখি, তাহলেই ঘুম আসবে দেখিস্।

চপল মৃদু হাসবার চেষ্টা করে, বলে—এইতো মা ঘুম থেকে উঠলাম, এখন কি আর ঘুম আসে ? তুমি যাও মা, তোমার অনেক কাজ পড়ে আছে। আমি এখন একলাই থাকতে পারবো। একটা কাগজ টাগজ দিয়ে যাও শুধু।

ওর মা ওকে একটা মাসিক পত্রিকা এনে দেন—যেটা ওর নামেই

এসেছিল। ওকে ভাল করে শুইয়ে দিয়ে যাবার সময় বলে যান—বিছানা থেকে যেন উঠিস না, চপল। এখনো তুই অত্যন্ত দুর্ব্বল, উঠতে গেলে হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে যাবি।

আচ্ছা—বলে ও পাশ ফিরে শোয়।

ভারতী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

চরম পর্য্যায়

নিস্তব্ধ চপলের কক্ষ। দেওয়ালের ঘড়িটা শুধু টিক্ টিক্ করে সে মৌন-সঙ্গীতের যতি রক্ষা করে চলেছে।

চপল চুপ করে শুয়ে থাকে, কিন্তু মনের মধ্য দিয়ে কত কি কথা ঝড়ের মত বয়ে চলে। সে ঝড়ের আবহের মাঝে ভেসে আসে হারিয়ে যাওয়া দিনের দুই চারিটী স্মৃতির ঝরা-পাপড়ি। ও তাদের টুঁটি টিপে মারতে চায় মনের মশানে, নিজেকে সবল করে তুলতে চায় বিচারের খড়্গ ঘুরিয়ে।

হাওয়ায় ম্যাগাজিনটা কিছু পাতা উল্টে প'ড়ে আছে। চপল চোখ মেলে চায়। শুয়ে শুয়েই কাগজখানিকে তুলে নেয় বুকের 'পরে। এক উন্মুক্ত পৃষ্ঠায় চক্ষু নিবদ্ধ করে ও স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে।

কাগজটার পৃষ্ঠায় মীরা আর মৃণালের যুগ্ম-প্রতিকৃতি ওর দিকে চেয়ে চেয়ে যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসে। চপল তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠাখানি টেনে ছিঁড়ে ফেলে অন্য প্রান্ত ওল্টায়। সে প্রান্তে গুঁজে রাখা বিলাতী মেলের একখানি চিঠি স্খলিত হয়ে ওর বুকের ওপর পড়ে। খামখানা চোখের সামনে মেলে ধরেও চপল বুঝতে পারে না এ চিঠি—তাকে কে পাঠাল। চিঠিখানার বহিরাবরণ উন্মুক্ত করে চপল পড়ে চলে—

Savoy Court Hotel
Granville Place Marble Arch
London, W. I

চপল,

আজ কতবার যে তোমায় ডাকতে ইচ্ছা করছে তা যদি জানতে! চপল, চপল, চপল!—শোন আমার কথা। উঃ ভারী যে মন কেমন করছে, তাকি পারছো অনুভব করতে? ও, তুমি বুঝি সাধনায় মগ্ন? মানুষের মনের ইতিহাস লেখ, অথচ সেই মানুষের মনই তোমার কাছে কত নগণ্য। তবু আমি জানতাম—তোমার মাঝে একদিন মূর্ত্ত হয়ে উঠবে মধুর প্রেম। তোমার কাছে এগুতে যাওয়ার শেষ দিনটা আজো আমার চোখের সামনে ভাসছে তার নিদর্শনরূপে। ডলি মরে গিয়ে মীরা বেঁচেছে তো! তবু তো জেগেছে প্রেম সাধনার কল্পমূর্ত্তির পাশে।

মাঝে মাঝে আমার মনের গোপনতন্ত্রীতে এমন অদ্ভুত এক আঘাত জাগে, যার আন্দোলনে সমস্ত অন্তরটা কাঁপতে থাকে—রয়ে রয়ে তবু তাকে অনুভব করবার চেষ্টা করি। অদ্ভুত এই মানুষের মন, না? ফুলের ছোঁয়ায় এর আনন্দ আবার কাঁটার খোঁচায় এর ব্যথা। মাঝে মাঝে প্রাণ-মন-রিক্ত-করা কোন এক উদাসী হাওয়া একে উতলা করে তোলে কোন সুদূরের জন্য। নামহীন, গোত্রহীন, রূপহীন, এক অজানার মায়ায় আমার মন ডানা মেলতে চায়—অনন্ত পিপাসা বুকে নিয়ে। কিসের এ হাহাকার, কার জন্য এ অন্তর-বেদনা আমি বুঝে উঠতে পারি না

যে! আমার চারিদিকে যেন এক বিরাট শূন্যতা—তার সীমা নেই, স্বস্তি নেই শান্তি নেই। সেই দূর-দূরান্তরে চেয়ে কল্পনার তুলিতে যে চিত্রলেখা এঁকে চলে আমার মন, তা প্রকাশ করা সভ্য সমাজের রীতি বহির্ভূত। দূরে সীমাহীন নীলাকাশের তলে পাহাড়-ঘেড়া জন-বিরল পথে কার সাথে যেন বর্ষণক্লান্ত প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতে সাধ হয়। আর কোন চাওয়ার কোন পাওয়ার বাসনাই থাকবে না আমার মাঝে। শ্রাবণের ধারার মত চঞ্চল অথচ বর্ষানদীর মত পূর্ণ থাকবে আমার মন কানায় কানায়। চতুপার্শ্বের রুদ্রতার মধ্যেও কেন ঝঙ্কার তোলে এমন কোমল, এমন মোহন একটা সুর বলতে পারো? আপন মনের সীমান্ত অবধি অবগাহন করেও এর নাগাল আমি পাই না।

সবই তো আমার আছে—রূপ আছে, অর্থ আছে, শিক্ষা আছে, সম্মান আছে—তবু দূরের মায়া, না পাওয়া কোন আবেশ আমায় এমন রিক্ত করে, কাঙাল করে আবাহন জানায়! সাত-সমুদ্রের পারের কোন অদৃশ্য দেবতার হাতছানিতে এমন সব হারাণোর দোলা লাগে মনে বলতে পারো চপল? বিশ্বের সকল জনার মধ্যে বাস করেও এ মহাশূন্যতা বুঝি ঘুচবার নয়। সংসার বোধহয় আমাকে চায় না, তাই সাগর নদী ডিঙিয়ে দূরের পাড়ি ধরা। তবু সে অনন্ত-খেয়ার মহাবাস্তবতা থেকে অবকাশ মিল্‌লেই আমার আদিম আমি, আমার সত্যকার 'আমি' মাথা তুলে দাঁড়ায় আমার মাঝে। তখন অশুচির মত লাগে এখানকার আকাশ-বাতাস,

মানুষ, আদান-প্রদান সবকিছু! কী অদ্ভুৎ অভিনয় চলেছে মানুষের নিত্যকার জীবনে, সত্য-বস্তুর কোন দামই নেই এখানে। এখানে অন্তরের চাওয়াকে প্রকাশ করা মহাপাপ—উপেক্ষা আছে জমা! দাবার ছকের মত পাতা সংসারে ধূর্ত্ততায় যে এগিয়ে যাবে, জয় তারই। কিন্তু শাশ্বত-কালের এ পাথর বাঁধানো রাস্তায় চলতে যে আমার মন সায় দেয়নি! তাইতো এই পালিয়ে বেড়ানো!

যে আবেষ্টনী বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন তদনুরূপ মন ও বুদ্ধি দিলে আর পাঁচজনের মত আমিও সুখী হতাম। হায়রে! সোজা করে মনের কথা জানানো যে এতবড় ভুল তাকি জানতাম! সামান্য একটা মেয়ের অন্তরের সত্যের কি দাম বলো? বড় বাজে বক্‌ছি, না? তবু বিশ্বাস—বন্ধুর কাছে বন্ধুর প্রলাপোক্তির অর্থ আছে, সম্মান আছে। বন্ধুই তো! একজন নারী আর একজন নারীর অথবা একজন পুরুষ আর একজন পুরুষের যতটুকু বন্ধু ঠিক ততটুকু মাত্র।

জানো চপল আমার মনে আজ কি সাধ জেগেছে? মুশাফির বেশে দেশে দেশে ঘুরে দেখতে যাবো নানা লোকের নানা প্রকৃতি। মানুষের মধ্যে কত বৈচিত্র্য কত পার্থক্য আছে, কত মন কত মানস আছে, কত চাওয়া কত পাওয়ার ধারা আছে তা জানবার বাসনা জেগেছে আমার মনে—দেখি এ মনের জোড়া মেলে কিনা। কাছে গিয়ে দেখার বিপত্তি, আছে, তাই দূর থেকে অনুভব করে, অনুমান করে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলবে সে দেখার কাজ।

কাছে গিয়ে নয়—ওরা পশুর চেয়ে সাঙ্ঘাতিক, আবার দেবতার চেয়ে সুন্দর। কেউ বা ভোলানাথের মত সর্ব্বস্ব দিয়ে সুখী, আবার কেউ বা ঠিক বিপরীত। ছোটবেলায় চিড়িয়াখানা যেমন কৌতূহলোদ্দীপ ছিল এখন মানুষগুলিকে ঠিক তেমনি লাগে—অথচ কত না দুর্জ্ঞেয়, দুর্ব্বোধ্য এই বুদ্ধিমান চিড়িয়াগুলি। জনে জনে আসে আমার পূজার ফুল কেড়ে খেতে—যে ফুল শুকিয়ে গেছে, রঙ গেছে ধূসর হয়ে, সৌরভ গেছে উধাও হয়ে।···চপল···

পুনশ্চ ঃ—কাল ঐ পর্য্যন্ত লিখেছিলাম তোমাকে পাঠাবো বলে। আজ এর দিকে চেয়ে দেখি কোনটারই কোন অর্থ হয় না, হয়তো বা আত্মাবমাননাই বহন করে নিয়ে যাবে এই অক্ষরগুলি, তবু তোমার নামে উৎসর্গ করা বস্তু আমি রাখতে চাই না, অপরকেও দিতে পারি না।

ইতি

'ডলি'

চপলের চোখের কোণে জলবিন্দু দেখা দেয়। ক্লান্ত আঁখি চেয়ে থাকে বাহিরের দিকে। ঠোঁট দুটী নিঃশব্দে নড়ে ওঠে, বলে—ক্ষমা ক'রো, ডলি। যে বিধাতা আজ তোমার জীবনে এই ব্যর্থতা এনে দিয়েছে তার পায়ে মাথা না খুঁড়ে, ব্যঙ্গের হাসিতে তার সিংহাসন কাঁপিয়ে তুলো। আজ যদি তুমি জানতে যে—যে-চপলকে তুমি মনের কথা বলেছ সে চপল মরে গেছে, শূন্য হয়ে সে মিলিয়ে গেছে ওই আকাশের বুকে! আজ যদি তোমার মত আমিও দেশে দেশে

ছুটে বেড়াতে পারতাম অগ্নিপুচ্ছ দুলিয়ে, মানুষের অন্তরের যা কিছু অবশিষ্ট আছে কোথাও কোন কোণে তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারতাম—তাহলে সার্থক হতো আমার আগমন। উঃ, ডলি।—পুরুষের মত বন্ধু যদি, মায়ের মত বন্ধু যদি—তাহলে হাত দিয়ে দেখতো কপাল-টায়—ওখানে আগুন ধরেছে কিনা।···উঃ মাগো···

চপলের মাথাটা বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়ে। সময় যায়!······

হঠাৎ টেলিফোনের আহ্বান ওর কানে পৌছায়। অবসন্ন দেহটাকে কনুই-এর ভর দিয়ে তুলে ধরে ও টলতে টলতে এগিয়ে চলে। ক্লান্ত কানের কাছে রিসিভার তুলে ধরে।

—হ্যালো, কে আপনি?

-- চিনতে পারছেন না?

—মানুষকে চিনিতে পারা অত সহজ কি? দুনিয়ার সকল মানুষ পরে' আছে ছদ্মবেশ। ছদ্মবেশ পরে' মানুষ মানুষকে ভোলায়, অভিনয় করে, অবিশ্বাসের আগুন জ্বালায়। মানুষকে অত সহজেই যে বিশ্বাস করে সে ভুল করে—মস্ত ভুল, যার দান দিতে গিয়ে তাকে রক্তবিন্দু নিঙড়ে দিতে হয়—ফোঁটায় ফোঁটায়। বুকে জ্বলে আগুনের জ্বালা, তবু তার নিস্তার নেই। যাক্ ওসব কথা। আপনি কে তাই বলুন। আপনার মিহি স্বর ভেসে আসে কানে, কিন্তু জেনে রাখুন মিহিস্বরে উদ্‌ভ্রান্ত হবার দিন হয়েছে নিঃশেষ। যদি হন পরিচয়কামী নবাগতা তরুণী, জানবেন সময় নেই, সামর্থ্যেরও অভাব।

—আপনি কবি, সাহিত্যিক মানুষ; সময়ের দাম তাই আপনার কাছে খুবই বেশী, নয়?

--বাজে খরচ করবার সময়ের সঞ্চয় নেই অন্ততঃ। কিন্তু কি বলছিলেন? কবি! কে কবি? আমি? ভুল করেছেন আপনি। আপনি কি কবি চপল বসুকে চান?

—তাইতো আশা করেছিলাম। আপনিই কি তিনি নন?

—হাঃ হাঃ হা—ভুল করেছেন, ভুল করেছেন। কবি চপল বোস যে মারা গেছে, আজ সকাল হবার সাথে সাথে। খোঁজ জানতেন না তার?

-- সে কি!

—হ্যাঁ, তাই তো। কাল রাত্রি পর্য্যন্ত সে ছিল বেঁচে। আজ আলো জাগবার সাথে সাথে সে নিয়েছে বিদায়।

—কিন্তু ভুল করছেন নাতো?

—ভুল? কবি চপল বোস ভুল করেছিল; তার প্রতিনিধি ভুল করে না। তারই ঘরে বসে, তারই টেলিফোন ধরে – যেটা সে নিয়েছিল কবি-প্রিয়ার প্রেরণায়, তারই চেয়ারের হাতলে বসে আমি বলে যাচ্ছি রূঢ় সত্য, কঠিন বাস্তব। ভুল এর ভিতর বাসা বাঁধতে পারে না।

— আপনি কে তবে?

—বললাম তো --তার প্রতিনিধি।

—নাম?

—মিষ্টার সি, কে, বোস।

—ওহ, হো, পরিহাস করছিলেন?

—পরিহাস করে নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই।

—না হয় হলোই খানিকটা অপব্যবহার।

—প্রয়োজন দেখি না।

— তবে ছেড়ে দিই রিসিভার ?

—ধরে রাখবার কোন আগ্রহই নেই।

—বাবা, হার মানলাম। এখন চিনতে পেরেছেন কি ?

—চেনাটাকে কানে বাজিয়ে নিতে চাই তবু।

—নাম বল্লেও যদি চিনতে না পারেন। পরিচয়ের সূত্র যদি গিয়ে থাকে ছিঁড়ে ?

—ছেঁড়া সুতোয় গাঁট বেঁধে টান দেবার স্পৃহা নেই।

—বলি নাম ?

—খুসী আপনার।

—মীরা, চিনলেন কি ?

—চিনবো না ! নিশ্চয়ই চিনেছি। ভান করে কথা বলার অভ্যাস আমার কোন কালেই নেই।

—কি করছো বন্ধু ?

—সময়ের অপব্যবহার আর কি।

—মনে পড়ে আমায় ?

—মনে করে দেখবো মনে পড়ে কি না।

—লিখছিলে কবিতা ?

—কবিতার সৃষ্টি করতে আমি জানি না। বল্লামই তো কবি চপল বোস মরে গেছে, তবে রেখে গেছে তার সত্যোপলব্ধির বাণী।

—শোনাবে সে বাণী ?

—তার আগে এতদিন পরে হঠাৎ মীরাদেবীর করুণার কারণ জানতে পারি কি ?

--কি হবে জেনে বন্ধু! অত্যুচ্চ সম্পদের বোঝা আর অসীম প্রাণ-হীনতার অবসর জীবনে বিস্বাদ জানালো, তাই নিলাম তোমার স্মরণ।

—এই অক্ষমের?

—বন্ধু!

—হয়তো বন্ধুই বটে -- তার চেয়ে এক রত্তি বেশী নয়।

—যদি দাবী জানাই?

—কিসের মূল্যে?

—পূর্ব্ব-পরিচয়ের মূল্যে?

—দাবী হবে অগ্রাহ্য, অহেতুক বলে।

—হেতু নিঃশেষ?

—তা কি নিজে বোঝ না? প্রয়োজনের দাবী পরিবর্ত্তনশীল।

—কি করছো বন্ধু?

—পরিচিতার সঙ্গে কথা বলছি।

—আঃ তা বুঝতে পারছি।

চপল দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে নেয়। এক হাতে মাথাটা সোজা করে ধরে, অন্য হাতে ধরে থাকে রিসিভার।

—চপল! চপল!

—বলুন মিসেস্ রায়।

—সোণার আলো আজো জেগেছে আকাশে।

—আকাশের গায়ে তাই আগুনের উৎসব।

—তোমার সাথে কথা বলে হাল্কা লাগছে মনের ভাব। ঠিক ভাবে মনের ভাবকে প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা যে।

—ভাবের অভাব হলো কেন মিসেস্ রায় ?

—ঐশ্বর্য্যের বোঝা, আর মানুষের সাথে পাশবিক সম্বন্ধ মনের গলা টিপে ধরেছে, শান্তি আর সার্থকতার আয়ু ফুরিয়ে গেল কোথা দিয়ে শোনাবে তোমার নতুন বাণী ?

—শোনাতে পারি, কিন্তু বাণী আমার নয় সে কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনাকে। মৃত কবি চপল বোস রেখে গেছে এই বাণী তার প্রতিনিধির পথে আলো জাগাবে বলে। ভাল লাগবে কি ?

—খুব লাগবে।

—ধৈর্য্য ধরতে পারো ?

—দেখই না পারি কিনা। সময় যে আমার কাছে নিতান্ত ভারী হয়ে উঠেছে।

—তবে শোন।

—উৎকর্ণ হয়েই আছি।

চপল মাথাটাকে জোরে ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রে সুরু করে :—

—"জাগো বন্ধু বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান্,
স্বপ্ত মুহ্যমান্
হিয়ারে করাও পান শমীলতা সম
প্রচণ্ড বহ্নির শিখা—মন্ত্র অনুপম।
স্বপন সৌধ তব যাক্ পুড়ে যাক্
হাল্কা-বোঁটার ফুল ধুলাতে লুটাক,
রোপিয়াছ নিজ করে তুমি যারে ভুলে —

কল্পনা মাধবী-লতা - বিষ ঢালো মূলে,
কল্প-তরুর ফুল ঝরুক ধুলায়
স্থতীব্র হেলায়
রঙীন তুলিকা
ছুঁড়ে ফেলে দাও বন্ধু! বাস্তব দীপিকা
লয়ে হও অগ্রসর—দুরূহ দুর্গম
অনন্ত যাত্রার পথে। সন্ধ্যা সমাগম
যবে হবে জীবনের, কহিও সবারে
সিন্ধুর তরঙ্গ আমি অসীম পাথারে
মিলাইতে যাই
ভাবের ফেনিল'চ্ছ্বাস মোর মাঝে নাই।"………

—চপল, এই কি স্থরু?

—না, এই শেষ।

— স্থরু কোথায়?

—স্থরু ভুলের মাঝে—যে ভুল ঘটালো প্রতিভার অপমৃত্যু।

—মরণের কথা বলতে নেই বন্ধু!

—হাসালেন মিসেস্…মিসেস্ রায়। জীবনের সাধন-বীণার অন্তরের গান গাইতে গিয়ে যার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, মীরা দেবী…যার নিজের মানসীই মারলো তাকে গলা টিপে……উঃ—চপলের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে—মী…মী…হ্যাঁ…মীরা দেবী……শুনছেন, না?…… কিন্তু আমাকে যে বলতেই হবে………আচ্ছা, বলুন তো মিসেস্ রায় —সে, মরণের কথা কইবো নাতো কি করবো? কবির কঙ্কাল পড়ে

আছে এই বাস্তব জগতের বুকে। বিষের জ্বালায় তার দেহ অসার হয়ে গেছে। পরিত্যক্ত টেব্‌ল্‌ থেকে উড়ে গেছে তার কল্পনার সৃষ্টি, যে ঘর তাকে এতদিন পরম স্নেহে আঁকড়ে রেখেছিল সে হারিয়েছে তার মানস-পুত্রকে। কল্পনা-পরিত্যক্ত ঘরে ঘর বেঁধেছে কঠিন নিশ্মম বাস্তব। প্রতিভা চপল বোস মরে গিয়ে শূন্য আসন ছেড়ে দিয়েছে বাস্তব মিষ্টার বোসকে। বল মীরা·····না, না ···বলুন মিসেস্‌ রায়—এ ছাড়া তার অন্য উপায় ছিল কি ?

ওধারে সহরের অপর প্রান্তে মীরা বসে থাকে—নিশ্চল, নির্ব্বাক ! মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক চিরে।

মিসেস্‌ রায় ! মিসেস্‌ রায়—স্বরের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়—হ্যালো, হ্যালো মিসেস্‌ রায়। কথা কইছেন না যে ! বলুন এ—ছাড়া তার অন্যগতি কি ছিল ?······বলুন মিসেস্‌ রায়—ছিল কি ?

—জানি না বন্ধু, হয়তো ছিল না, কিংবা···হয়তো ছিলও।

ছিল !—ওজোর দিয়ে বলে—কি ছিল মিসেস রায় ! বলুন কি ছিল ? মনের লাইট্‌ ফোকাস্‌ করা অন্য ক্ষীণে ? এই কি বলতে চান ?

— তাই যদি বলি ? প্রতিভা তাহলে বেঁচে তো থাকতো !

— ভুল করেছেন আপনি। জগতের সকলেরই মনের ধারা কি একই। সব গাছেই কি সাত-রঙা ফুল ফোটে ? সবাই কি আর মৃণাল রায়, অঞ্জলি সোম, মিস্‌ সেন ? প্রেমের অভিনয় করে, হীরে-মুক্তোর জৌলুশ্‌ দেখিয়ে, ব্যাংকের হিসাব সামনে ধরে সবই কি আর বাজারের পথ ধরে ? রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে আমার কথাগুলো, না ? কি করবো বলুন, মৃত প্রতিভার কঙ্কাল যে আমায় খুঁচিয়ে আছে।

--ঠিকই বলেছ বন্ধু, রুক্ষতার কিইবা আছে এতে ? কিন্তু ওকথা বন্ধ করবে ! তার চেয়ে শোনাও কবির অসমাপ্ত কবিতা।

—বেশ, জিজ্ঞাসা করছিলে না এর সুরু কোথায় ? শোন তবে—

—"এই বুঝি গেহ তব মিত সাধনার,
ফুৎকারে নিভে গেছে যেথা দীপাধার
তোমার মানস-লোকে ! তাই আঁখি জল
নীরব নিভৃতে বসি' ফেল অবিরল।
কালিমা ছেয়েছে তাই তোমার নয়নে,
চাইতে পার না আজি সুমুখের পানে।
আঁধিয়ার মাঝে করি' আপনা গোপন
ক্ষয়িষ্ণু জীবন আর অবসন্ন মন
তাই বুঝি খোঁজে নীরবতা,
আলোর বারতা
রুদ্ধ দুয়ারে তব করাঘাত হানি'
ফিরে যায় পরাজয় মানি' ?"

* * * *

—কিসের পরাজয় ?

—শোন কিসের পরাজয় : -

বেসেছিলে ভালো !
নারী-প্রেমে ভুলেছিলে জগতের কালো ?
হায় বন্ধু ! বুঝিয়াছি হেথা একদিন
প্রেমের স্বপন রচি' আছিলে বিলীন

—তোমা' ভালোবাসি
নারী-মুখে সে বাণীতে গিয়েছিলে ভাসি
প্রেমের কুটীল স্রোতে—করিয়া সম্বল
শুধু আঁখিজল!
তাই বুঝি হেথা বসি একা একা কাঁদো,
জীবন বীণার তারে মরণের সাধো?
তিলে তিলে ক্ষয়ে যেতে চাও—
ভঙ্গুর প্রেমিক রূপে আপনা বিকাও?

* * * *

—প্রেমের কুটীল স্রোত!

—হ্যাঁ মিসেস্ রায়। তা না হলে কি আর পরের কথাগুলো কবিকে লিখতে হতো?

—"যে জন কহিয়াছিল—'তোমা ভালবাসি'
অবহেলা ভরে শুধু হাসি
আজ বুঝি কয়েছে সে জন
অপরের বাহুমাঝে রহি নিমগন—
ক্ষণিকের ভুল এ যে যৌবনের দান
বাস্তব নিকষে যার ছায়া পড়ে ম্লান?"
—তাই বন্ধু সব ঘুচিয়াছে?
জীবন অমৃত-বারি মরু শুষিয়াছে?
যাহারে প্রাণের চেয়ে ভালোবেসেছিলে
তাহারি সকাশে অবহেলা বিষ মিলে

কঠিন নির্ম্মম,
রহিয়া রহিয়া জ্বলে তুষানল সম ?
সব আশা, সব সাধ হয়েছে নিঃশেষ—
আজ শুধু ব্যথা অবশেষ ?
তাই বুঝি দেবদাস নকল-নবীশ
নিভৃতে করিছ পান মরণের বিষ ?
আঁখিজল দিয়া হবে ইতিহাস লেখা !
অমর করিতে চাও ক্ষণ মোহ-রেখা !

— থামো বন্ধু, এগিয়ে আর কাজ নেই……

—এবে সবে সুরু মিসেস্ রায় ! ওকি, কাঁদছো ? ও যে পরিহাস। জীবনের কুঞ্জ-কাননে তোমরা মধুপ, আশা তোমাদের নিত্য পূর্ণায়মানা। কিন্তু সকল আশা যার মরীচিকা সম বিফল হয়ে গেল, জীবনের অমৃত গেল অগস্ত্যের চুম্বনে শুকিয়ে, রইল শুধু গরল— তার সান্ত্বনা কোথায় ? আজ প্রেমিক চপল বোস বেঁচে থাকলে সে হাসতো তোমার রোরুদ্যমানা বাণী শুনে। শুনুন মিসেস্ রায় তার সান্ত্বনার বাণী :—

—"নারী, নারী, নারী, শুধু নারীই কি সব ?
আর কিছু নাই শ্রেয়ঃ কামনা আসব !
নারী ছাড়া আর কিছু নাই ত্রিভুবনে।
কামনা জাগাতে পারে পুরুষের মনে ?

ভালোবাসা শুধু নারী ছাড়া নাহি চলে
উন্মুক্ত গগন-তলে
আর কিছু নাহি ভাবিবার বুঝিবার!
অশান্তি অপার
পুরুষের হিয়া শুধু নারীরে চাহিয়া
জীবনের সুধাভাণ্ড দিবে উজাড়িয়া!

ভুল সবই বন্ধু! প্রেম ক্ষণিকের মোহ,
ক্ষণিক জ্বলিয়ে নেভে সব সমারোহ,
দিবস আলয় মাগে আঁধারের মাঝে
উজল নয়নে শুধু কালিমা বিরাজে।
ওগো নাই কিছু নাই,
এ ধরণী মাঝে প্রেম বলি কিছু নাই।
নয়ন প্রসারি' দেখ - সবই স্বার্থ-ভরা
ক্লিষ্ট পিষ্ট ধরা
একা পড়ে আছে ওই ধুলিমাখা দেহ
তার বুকে চলে নিতি রক্ত অবলেহ।
প্রেম বলি যা চলেছে মানবী মানবে
সে শুধু ছলনা কূট, গরবে
স্বার্থ নিয়ে হানা হানি বিষধর হেন
মেলি' লক্ষ ফণা—তারে প্রেম বল কেন?

প্রেম মোহ, অভিশাপ— ভালোবাসা ভুল
সকালে-ধরানো-কলি —বিকালে সে ফুল
ঝরে যায়, মাত্র বেঁচে থাকে বৃন্ত'পরে
ক্ষণিকের মোহ-রেখা—কালের সাগরে
ডুবে যায়, মুছে যায়, লুপ্ত হয়ে যায়
ভালোবাসা মিশে যায় স্বার্থের সীমায়।

* * * *

-- তোমার কবি কি অন্ধ হয়েছিল মিষ্টার বোস ?

—ভালোবাসার অভিনয় দেখে দেখে তার চোখ হয়তো পচে গিয়েছিল মিসেস্ রায়। তার ঘরের ভিতর বসে তার বাস্তব প্রতি-নিধি আমি আজো শুনতে পাই—"কথা কও বন্ধু······কবি। স্বপ্নকে রূপ দেবার চেষ্টা করছি মনে মনে···বন্ধু। ভুলবে নাতো?···এই রইল আমার আত্মোৎসর্গের চিহ্ন······"বলুন মিসেস্ রায় একথা বল্‌লে তার কি অপরাধ করা হবে ?—

"সৃজনের আদিকালে পুরুষ আদম
লভেছে জনম
নারীহীন বিশ্বমাঝে, রহি আত্মহরা
কাটায়েছে ধ্যানে দিন ; শ্যামায়িতা ধরা
প্রাণে জোগায়েছে মধু
তাহারে বাঁধিতে শুধু
ইভের সৃজন। নারী শৃঙ্খল-মূরতি
বিষ-কুম্ভ বুকে ধরি জানাল মিনতি

আদমের কাছে
ভিখারিণী সমা নারী নরের করুণা মাগিয়াছে।
আদম চাহেনি কভু ইভেরে জীবনে,
আদমে চেয়েছে ইভ্ সাধিয়া চরণে।

*　　　*　　　*　　　*

—চপল! থামো বন্ধু। কবির মানসী যে সেখেই ধরা দিয়েছিল কবির মানস-লোকে তা আমি জানি? এ শ্লেষ হয়তো তার উপযুক্তই বটে। কিন্তু

— কিন্তু কি মীরা রায়?

—কিন্তু একজনের দৃষ্টান্তে সমগ্র জাতিকে অপমান করার অধিকার কবির নেই, মিষ্টার বোস।

—আপনি বুঝছেন না মিসেস্ রায়—কবি শুধু মিস্ সেনের জাতিকেই উদ্দেশ করেছিলেন।

—ইভের জাতি বল্লে মাতৃজাতিকেও বোঝায়, চপলবাবু।

—বোঝায় না মিসেস্ রায়। ইভ্ মাতৃজাতি হয়ে অবতীর্ণা হয়নি, তার সৃষ্টি আদমকে বন্ধনবান্ করে তুলবার জন্যেই। কবি জানতো এবং মানতোও যে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব না থাকলে পৃথিবী এতদিন রসাতলে যেত। তাঁর কথা এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক মীরা দেবী। কবির মা এখনো বেঁচে আছেন। তার টেবিলের কাগজ পত্রগুলির দিকে চেয়ে আজো তাঁর চোখে অশ্রু নামে। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর চপল বিশ্বজয়ী হবে। তাঁকে কি সান্ত্বনা দিব বলুন তো।

—বুঝলাম ; কিন্তু শুধু শ্লেষ আর বিদ্বেষ দিয়েই কি নিজেকে সবল করা যায়, না প্রতিশোধ নেওয়া যায় ?

আপনার কথা শুনে হাসি পায়—চপলের শুষ্ককণ্ঠ থেকে হাসির ক্ষীণ আওয়াজ রিসিভারের পর্দ্দায় তরঙ্গ তোলে। মাথাটা ঘুরে যেতে যেতে ও খুব সামলে নেয়, হাতের রিসিভারটা বারেক স্খলিত হয়ে হাতশুদ্ধ কোলের কাছে নেমে আসে। চপল সেটাকে আবার জোর করে ঠেলে তোলে কানের কা.ছ, বলে—মি·· মি···মিসেস্ মৃণাল রা···য় ! প্রতিশোধ ? কার ওপর ?······যে নিজেই বরণ করলো মৃত্যুকে সে আবার প্র··· হাঃ···হাঃ· প্রতি···শোধ· নেবে কার· ওপর, লাভ কি তাতে ? ভবিষ্যৎকে সম্বল করার জন্য সে বলে গেছে—

'দীপ্ততর "—চপল নিজের থুথু গিলে কণ্ঠকে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলে :—

"দীপ্ততর রবিকর ছেয়েছে গগন,
ওঠ বন্ধু ! ওই শোন ভরিয়া ভুবন
কর্ম্মের সঙ্গীত বাজে নিতি নব তানে,
পুরুষের ডাকে ওই দিবালোক পানে।
দৃঢ়চিত্ত নর
নিয়োজিত করিতাম সুকঠিন কর
রচেছে যতেক সৃষ্টি গৌরব ধরার
অক্ষয় অপার
মৃত্যুহীন কীর্ত্তিরাশি
বৈচিত্র্যবিহীনা নারী, নারী সর্ব্বনাশী।

ধর হাত ওঠ বন্ধু এস বাহিরিয়া
কালচক্র সম চলি' দিক মুখরিয়া
প্রচণ্ড কর্ম্মের রথ—
সম্মুখে দিগন্তব্যাপী পড়ে আছে পথ।
লৌহের সংঘর্ষ সেথা অঙ্গ রক্তঝরা
শাসিয়া চলেছে নিত্য শ্যাম বসুন্ধরা।
—কোমলের সেথা স্থান কোথা!
সংঘর্ষের অট্টহাসি ঘোষিচে বারতা—
নাই ওরে নাই,
নারী নাই, প্রেম নাই, স্বপ্ন হেথা নাই;
শুয়ে শুয়ে শয্যা 'পরে স্বপ্ন দেখা আঁখি
আপনার পৌরুষেরে দিয়ে যাক ফাঁকি
রমণী-সুলভ-হিয়া,হেথা নাই স্থান—
হেথা আছে শ্রেষ্ঠতর জীবন মহান।"

—মীরা দেবী!

—বলো চপল।

- কেমন লাগে?

—তুমি যাকে জীবনে সহজ করে তুলতে চাইছো, তা যে কতবড় কঠিন তা কি ভেবেছ একবারও?

ভাববার কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন কি কিছুই নেই? নিজের দেহও তো আছে? সে যদি সইতে না পারে এই পরিবর্ত্তনের বিদ্রোহ?

দেহের প্রয়োজনই এবার মিটাবো মীরা দেবী। মনের প্রয়োজনকে মিটাতে গিয়ে দেখলাম শুধুই পরাজয়। মানস জগৎ বলে একটা জগৎ যে ছিল তা ভুলবার চেষ্টা করছি। কবি মরেছে, তার স্থানে জেগেচে বাস্তব। কাব্য-সৃষ্টি করতেও যে অর্থের প্রয়োজন হয়, অন্তরের প্রেমকে প্রকাশ করার আগে যে বাস্তব জগতে নিজের মূল্য বিচার করতে হয়, অর্থহীনের ভালোবাসাও যে অর্থহীন—একথা এবার আমি বুঝেছি। বহির্জগতের মাপে চপল অক্ষম ছিল বলেই না তার মানস-প্রিয়া, কল্পনার প্রেরণা, সাধনার সাথীকে অপরে ছিনিয়ে নিতে পারলো? জগতে মানুষ যাচাই হয় টাকার নিক্তিতে, প্রেমও তাই, কাব্যও তাই—সে কথা মনে রেখেই চলবার চেষ্টা করবো। অর্থ, আভিজাত্য, বিলাস আর অভিনয় তোমাকে ছিনিয়ে নিয়েছে মীরা—দোষ তোমার নেই—ভুল করেছিলাম আমি। নিজের সুখ, সম্পদ, বিলাসের মাঝে তুমি হয়ে আছ মগ্ন মিসেস্ রায়। পিছনে ফিরে তাকাবার অবসর তোমার হয়তো জুটবেই না, আর লাভই বা কি বল! কিন্তু পাথেয় অভাবে যে সম্বলহীন পথিক পথ হারালো, সে আজ থেকে চেষ্টা করবে কোনদিন যদি পারে তোমাদের পথের পাশে গিয়ে মিলতে। এই আশা বুকে ধরে সে পথ চলবে সকল স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে। জীবনের সতেজ চারা যার ভুলের গরলে কুঁকড়ে শুকিয়ে গেল, হয়তো আবার একদিন তা গজিয়ে উঠবে শাখা-প্রশাখা মেলে কিন্তু সে ফল ফলাবে অন্য জাতের, রঙ

হবে তার আলাদা। সে রঙ মিলাবার চেষ্টা করবে তোমাদের রঙে।...

......মিসেস্ রায়! শুনছেন? চপল বোস, কবি চপল বোস, সাহিত্যিক চপল বোস, প্রতিভা চপল বোস মরেছে। নিজের ওপর প্রতিশোধ নিতেই সে মরেছে, করুণা দেখাবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন, করুণা সে চায়নি।

—ছিঃ, ছিঃ চপল, মরণের কথা মুখে উচ্চারণ করতে নেই বন্ধু!

—হাঃ হাঃ হাঃ, ওহ্ হোঃ.........মীরা......মিসেস্ রায়, চপল বোস মরেছে মরেছে মরেছে। মরাই তার উচিত, ভুলের গরল পান করে মরণই তার একমাত্র প্রাপ্য। মী...রা দে.. বী...চপল বোস অতীতকে ভুলতে বলে গেছে। কর্ম্ম জগতের এবার নামবে তার প্রতিনিধি অর্থের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার উদ্দেশ্যে, আমিই তার বাস্তবরূপ মিষ্টার বোস। সে প্রতিযোগিতার পথে দয়া নেই, মায়া নেই, স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই; আছে শুধু উল্কার মত বিদ্যুৎগতি। দিন যদি কোনদিন ফেরে, মনের গহনে নিভানো প্রদীপ যদি আবার অন্তরঙে জলে ওঠে সেদিন বাড়ী করবো আপনারই বাড়ীর পাশে। নিজের চোখ-ঝল্সানো মোটরকারে, হীরের আঙটীপরা হাতে ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে কবে আসবে নিমন্ত্রণ। সেদিন আপনি কথা রাখবেন তো? সেদিন আমি হবো মিষ্টার বোস—ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে প্রতিভাত হবে যার মর্য্যাদার মূল্য, পার্টিতে পার্টিতে চলবে যশোগান, সম্বর্দ্ধনা সভা বসবে দিকে দিকে। বলুন মিসেস্ রায়, সেদিন কি আমার নিমন্ত্রণে আমার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারবেন? সে মিলন কক্ষে

চায়ের টেব্‌লের সামনে সাজিয়ে রাখবো প্রতিভা চপল বোসের কঙ্কাল। সেদিন তার দিকে তাকিয়ে যেন ভয় পাবেন না মিসেস্ মীরা রায়।……উঃ মীরা! কবি চপল বোস মরেছে কি কম বড় আঘাতে!! আজো তার……না…না মীরা……ওকি! কিসের আওয়াজ ভেসে আসে! ও, কাঁদছো বুঝি? চোখে এসেছে জল! কিসে! অন্তর্বেদনায়? না……করুণায়?

চপল অবলম্বন খুঁজে বেড়ায়, ওর পায়ের নীচেকার মাটী যেন সরে যাচ্ছে।

……মীরা! মীরা!……দেখতো আমার বুকটায় কি হলো? দেখনা মীরা দে…খ…। ও, তুমি বুঝি নাগালের বাইরে! আর যে পারছি না বন্ধু।……একি! পায়ের তলার মাটী কাঁপছে কি?… মীরা…পালাও…ভূমিকম্প… মী…রা ভূমিকম্প…উঃ…মী…

-- চপল! চপল! বন্ধু। কবি! কোথায় তুমি? হ্যালো… চপল… কথা কও, কও বন্ধু…কোথায় গেলে? এঁ্যা, ও কিসের শব্দ? বজ্র পড়লো কি? চপল। চপল…বজ্র, চপল বজ্র, চপল!……

ওর মা দুধের বাটী হাতে করে এসে দেখেন চপলের জ্ঞানশূণ্য দেহ মাটীতে পড়ে আছে।

গল্প শেষ করে অজয় উঠে দাঁড়াল। আমি বসেছিলাম অভি-ভূতের মত। একটা সিগারেট ধরিয়ে ও বল্‌ল—"অসিৎ! কবি

চপল বোস মরে গেছে—এইখানেই এ গল্পের শেষ। তবে দেশ হারাল একজন প্রতিভাকে—এই যা দুঃখ। হ্যাঁ বলছিলি না আজকাল কি করি? একটা কটন্ মিলের সরঞ্জাম প্রায় যোগাড় করে ফেলেছি, আশা আছে জমবে মোটা অঙ্ক। একটা শেয়ার ফর্ম্ম সই করবি?"

ব্রতী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী।